ইসলামী আন্দোলন

সাফল্যের সম্ভাবনা

ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদক : মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব

আইসিএস পাবলিকেশন

ইসলামী আন্দোলন : সাফল্যের শর্তাবলী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ

মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায়

আইসিএস পাবলিকেশন

৪৮/১-এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৮৬

প্রথম সংস্করণ : জুলাই, ১৯৯৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল, ২০০৪

তৃতীয় সংস্করণ : নভেম্বর, ২০২০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

আশিক খন্দকার

মূল্য : ৬০ (ষাট) টাকা মাত্র

Islami Andolon : Safoller Sartaboli- Syed Abul A'la Maududi, Translated by Abdul Mannan Talib, 1st Edition, July 1986, Published by ICS Publication, 48/1-A, Purana Paltan, Dhaka-1000. Price 60 Tk. Only.

প্রকাশকের কথা

এই পৃথিবীর বুকে মানুষের কোনো উদ্দেশ্য, কোনো আন্দোলন, সংস্কারমূলক কোনো পদক্ষেপ সফলকাম হতে পারে না যতক্ষণ না সেই আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে আন্দোলনের বিশেষ গুণগুলো দেখা যায়। উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন, আন্দোলন যতই মুক্তির প্রতিশ্রুতিশীল হোক না কেন, কর্মীরা তাদের চরিত্রকে সুন্দর, বলিষ্ঠ, উন্নত আর উজ্জ্বল করতে না পারলে সফলতার স্বপ্ন নিছক কল্পনাই রয়ে যাবে।

সমস্যাসঙ্কুল এই দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ বিনির্মাণের কাজে সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার উত্তম পথ আর নেই। তাইতো এ আন্দোলন তার কর্মীর কাছে স্বাভাবিকভাবেই আশা করে অধিক কর্মপ্রেরণা, ত্যাগ আর কুরবানি। দাবি করে বিশেষ যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের।

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.) সহজ সরল ভাষায় এই পুস্তকে সেসব গুণাবলির প্রতি আলোকপাত করেছেন যেসব গুণাবলি ইসলামকে যারা দুনিয়ায় বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান তাদের পুঁজি হওয়া উচিত। এই মূল্যবান বইটি প্রকাশ করতে পেরে তাই মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি।

ভূমিকা

যারা সত্যিই একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ করতে চান তাদের সর্বপ্রথম ভালোভাবে উপলব্ধি করতে হবে, আমাদের জাতির মধ্যে একটি আদর্শ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষার মোটেই অভাব নেই। আসল অভাব আগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণের এবং তার চাইতে বেশি অভাব যোগ্যতার। এ কাজের জন্য যে মৌলিক গুণাবলির প্রয়োজন অধিকাংশ লোকের মধ্যে তা অনুপস্থিত।

দ্বিতীয় যে বিষটির প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হবে তা হচ্ছে, আমাদের জাতির সমগ্র প্রভাবশালী অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজে বিকৃতি ও ভাঙন সৃষ্টিতে মুখর। আর যারা বিকৃতি ও ভাঙনের কাজে লিপ্ত নেই তারাও সৃষ্টি ও বিন্যাসের চিন্তামুক্ত। সমাজ সংস্কার ও গঠনের প্রচেষ্টারত ব্যক্তিদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

তৃতীয় যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে, বর্তমান যুগে সমাজ জীবন পরিগঠন ও ভাঙার বৃহত্তম শক্তি হচ্ছে সরকার। আর যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকে সেখানে জনগণের মধ্যে উপযুক্ত বা অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতে শাসন ক্ষমতা সোপর্দ করার ওপরই সরকারের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা নির্ভরশীল। ভাঙার কাজে যারা লিপ্ত থাকে তারা, জনগণ যাতে কোনোদিন নির্ভুল নির্বাচনের যোগ্য না হতে পারে সেজন্য জনগণকে প্ররোচিত করার কাজে যত শক্তি ব্যয় করে অন্য কাজে তত ব্যয় করে না।

এ তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে একটি ভয়াবহ দৃশ্য সৃষ্টি করে যা প্রথমাবস্থায় মানুষের মনে নিরুৎসাহের সঞ্চার করে এবং চারদিকের নৈরাশ্যের মধ্যে সে চিন্তা করতে থাকে, এখানে কোনো কাজে সফলতা কি সম্ভব? কিন্তু এগুলোর বিপরীতে আরও কতিপয় বিষয় রয়েছে, যেগুলো সামনে রাখলে নিরাশার মেঘ কেটে যেতে থাকে এবং আশার আলোকচ্ছটায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

প্রথমটি হচ্ছে, আমাদের সমাজ কেবল অসৎ লোকের আবাসস্থল নয়, এখানে কিছু সংখ্যক সৎ লোকও আছে। তারা কেবল সংশোধন ও চরিত্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ করে না; বরং তাদের মধ্যে আগ্রহ ও

যোগ্যতা রয়েছে। আর এর মধ্যে কিছুটা অভাব থাকলেও সামান্য প্রচেষ্টায় তা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমাদের জাতি সামগ্রিকভাবে অসৎপ্রবণ নয়। অশিক্ষা ও অজ্ঞতার দরুন তারা প্রতারিত হতে পারে এবং প্রতারিত হয়ে আসছে, কিন্তু প্রতারণাকারীরা যে বিকৃতির সম্মুখীন করে তার ওপর তারা সন্তুষ্ট নয়। বিচক্ষণতার সাথে সুসংবদ্ধ ও অবিরাম প্রচেষ্টা চালালে দেশের জনমতকে অবশেষে সংশোধন প্রয়াসী শক্তিগুলোর সমর্থকে পরিণত করা যেতে পারে। সমাজে অসৎ শক্তিগুলোর প্রভাবের ফলে যে সমস্ত অনাচারের সৃষ্টি হচ্ছে জাতির বৃহত্তম অংশ খোদ তার পরিপোষক হলে অবশ্যই নিরাশার কথা ছিল। কিন্তু আসল পরিস্থিতি তা নয়।

তৃতীয় কথা হচ্ছে, যারা বিকৃতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে তারা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভ করেছে কিন্তু দুটি সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। এক. চারিত্রিক শক্তি। দুই. ঐক্যের শক্তি।

সর্বশেষ ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আল্লাহ তাআলার নিজের কাজ। এজন্য যারা প্রচেষ্টা চালায় তারা আল্লাহর সমর্থন লাভ করে তবে শর্ত হচ্ছে এই, তাদের সবর ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা পরিহার করলে চলবে না। এ ধরনের লোক যতই স্বল্প সংখ্যক হোক না কেন এবং তাদের সাজ-সরঞ্জাম-উপকরণাদি যতই সামান্য হোক না কেন অবশেষে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তাদের সকল অভাব পূরণ করে দেয়।

আপাতঃ নৈরাশ্যের পেছনে আশার এ আলোকচ্ছটা একটি আদর্শ ইসলামী সমাজের কেবল সম্ভাবনার উন্মেষ সাধনই নয়; বরং তার সফল প্রতিষ্ঠারও দিগন্ত উন্মুক্ত করে। তবে প্রয়োজন হচ্ছে, যারা এ কাজের সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মনিজল অতিক্রম করে কিছু করার জন্য অগ্রসর হতে হবে এবং সাফল্যের জন্য আল্লাহ যে নীতি পদ্ধতি নির্ধারণ করেছেন সেই পদ্ধতিতে এগিয়ে যেতে হবে। আপনি কেবল অসৎ কাজ ও দোষত্রুটির সমালোচনা করে যাবেন এবং সেগুলো নিছক আপনার কথার জোরে শুধরে যাবে, এটা আল্লাহর নীতি নয়। আপনি হাত ও পায়ের শক্তি

ব্যবহার না করা পর্যন্ত জঙ্গলের একটি কাঁটা এবং পথের একটি পাথরও সরে না। তাহলে সমাজের দীর্ঘকালের দোষত্রুটিগুলো নিছক আপনার কথার জোরেই বা কেমন করে দূর হতে পারে? কৃষকের পরিশ্রম ছাড়া ধানের একটি শীষও উৎপন্ন হয় না। তাহলে নিছক দুআ ও আশার মাধ্যমে কেমন করে সমাজে সততা ও সৎপ্রবণতার সবুজ শ্যামল শস্য উৎপাদনের আশা করা যেতে পারে? যখন আমরা ময়দানে নেমে কাজ করি এবং আল্লাহর নিকট সাফল্যের দুআ চাই তখনই সমালোচনা কার্যকর হয়। নিঃসন্দেহে ফিরিশতাদের আগমন ঘটে। কিন্তু তারা নিজেরা লড়াই করার জন্য আসে না; বরং যে সকল সত্যপন্থী আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য লড়াই করতে থাকে তাদেরকে সাহায্য করতে আসে। কাজেই যাদের মনে কাজ করার আগ্রহ আছে তাদের মিথ্যা আশা-আকাঙ্ক্ষার পথ পরিহার করে সুস্থ মস্তিষ্কে এ কাজের যাবতীয় দাবি ও চাহিদা উপলব্ধি করা উচিত। অতঃপর তারা কি সত্যই এ কাজ করবেন, না নিছক সমাজের বিকৃতি দেখে অশ্রুপাত করবেন এবং সমাজ গঠনের আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করেই ক্ষান্ত হবেন, এ ব্যাপারে যথার্থ চিন্তাভাবনা করে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। কাজ করার সিদ্ধান্ত যিনি করবেন তিনি উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে নয়; বরং সুস্থ মস্তিষ্কে ভেবে চিন্তেই করবেন। সাময়িক উত্তেজনার বশে মানুষ বন্দুকের সামনে বুক পেতে দিতে এবং প্রাণ দান করতে পারে কিন্তু সাময়িক উত্তেজনার বশে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সারা জীবন পরিশ্রম করা তো দূরের কথা মাত্র চারদিন কোনো অসৎ কাজ থেকে দূরে থাকা অথবা কোনো সৎ কাজের ওপর অটল থাকা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। যারা সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিজেদের সমগ্র জীবন গঠনমূলকভাবে নিয়োগ করতে প্রস্তুত হয় একমাত্র তারাই এ কাজ করতে পারে।

কাজ করার আগ্রহ ও উদ্দেশ্য গ্রহণের সাথে সাথে মানুষ সাধারণত কর্মসূচির প্রশ্ন উত্থাপন করে। কিন্তু তারা ভুলে যায়, কর্মের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচির মধ্যবর্তী স্থানে কর্মীর নিজের সত্তাই হচ্ছে কাজের আসল ভিত্তি ও নির্ভর। এ বিষয়টিকে বাদ দিয়ে কাজ ও কর্মসূচির কথা বলা ঠিক নয়। কাজ করার জন্য কেবল সংকল্পই যথেষ্ট এবং এরপর শুধুমাত্র কর্মসূচির প্রশ্ন থেকে যায়, এ কথা মনে করা ভুল। এ ভুল ধারণার কারণে আমাদের এখানে অনেক

বড়ো বড়ো কাজ শুরু হয়েছে এবং পরে তা চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই কর্মসূচি ও পরিকল্পনা আসল নয়, আসল হচ্ছে এগুলোর বাস্তবায়নে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ও তাদের চারিত্রিক গুণাবলি এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক গুণাবলি। কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার মূলে এটিই আসল কার্যকর শক্তি। ব্যক্তির প্রতিটি দুর্বলতা কাজের ফলাফলকে প্রভাবিত করে এবং তার প্রতিটি গুণ কাজকে সুষমামণ্ডিত করে। সে উন্নত ও উত্তম গুণাবলির অধিকারী হলে একটি ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা ও বাজে কর্মসূচিকেও এমন সফল পরিচালনার মাধ্যমে চূড়ান্ত লক্ষে উন্নীত করে যে মানুষ অবাক হয়ে যায়। বিপরীতপক্ষে তার যোগ্যতার অভাব থাকলে উত্তম কাজও পণ্ড হয়ে যায়। এমনকী অযোগ্য লোক যে কাজ সম্পাদনে সচেষ্ট হয় তার নির্ভুলতা সম্পর্কেও মানুষের মনে সন্দেহ জাগে। কাজেই সংস্কার ও গঠনমূলক বাস্তব পরিকল্পনা সম্পর্কে চিন্তা করার আগে এ কাজ সাধনের জন্য যে সব লোক এগিয়ে আসবে তাদের কোন ধরনের যোগ্যতা থাকতে হবে, কোন ধরনের গুণাবলি সমন্বিত হতে হবে এবং কোন ধরনের দোষত্রুটি থেকে তাদের মুক্ত হতে হবে, ওপরন্তু এ ধরনের লোক গঠনের উপায়-পদ্ধতি কী, এ ব্যাপারেও যথাযথ পর্যালোচনা করতে হবে।

পরবর্তী আলোচনায় এ বিষয়টিকে আমরা নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে বর্ণনা করব।

১. এ উদ্দেশ্যে যারা কাজ করে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিগত যেসব গুণ থাকা উচিত।

২. তাদের মধ্যে সামষ্টিক পর্যায়ে যেসব গুণ থাকা উচিত।

৩. ইসলাম প্রচার, ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সাফল্য অর্জনের জন্য যেসব গুণ থাকা উচিত।

৪. ব্যক্তিগত ও সামষ্টিকভাবে যেসব বড়ো বড়ো দোষ ত্রুটি থেকে তাদের মুক্ত থাকা উচিত।

৫. অভিপ্রেত গুণাবলির বিকাশ সাধনে ও অনভিপ্রেত গুণাবলি থেকে ব্যক্তি ও সমষ্টিকে মুক্ত রাখার জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে।

দুনিয়ায় ইসলামী জীবনব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহর সাহায্যের

পর সাফল্যের দ্বিতীয় চাবিকাঠি হচ্ছে এ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রচেষ্টারত ব্যক্তিবর্গের নিজস্ব গুণাবলি। কতিপয় গুণাবলি ব্যক্তিগতভাবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে থাকতে হবে। কিছু গুণাবলি সমষ্টিক পর্যায়ে তাদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আরও কিছু গুণাবলি সংস্কার ও গঠনমূলক কার্য সম্প্রসারণের জন্য তাদের মধ্যে থাকতে হবে। আবার কতিপয় দোষত্রুটি থেকে যদি তারা নিজেদের মুক্ত না রাখে তাহলে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। সবার আগে এ বিষয়গুলো অনুধাবন করতে হবে। ফলে, যারা এ খেদমতের সত্যিকার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ তারা নিজেদের অভিপ্রেত গুণাবলির লালন ও অনভিপ্রেত গুণাবলি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হতে পারবে। সমাজ গঠনের জন্য এভাবে ব্যক্তি গঠন হচ্ছে প্রথম শর্ত। কারণ, যে নিজেকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করতে পারে না সে অন্যকে সজ্জিত ও বিন্যস্ত করার ব্যাপারে কিছুই করতে পারে না।

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৪
ব্যক্তিগত গুণাবলি	১১
ইসলামের যথার্থ জ্ঞান	১১
ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস	১২
চরিত্র ও কর্ম	১৩
দ্বীন হচ্ছে জীবনোদ্দেশ্য	১৪
দলীয় গুণাবলি	১৬
ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা	১৬
পারস্পরিক পরামর্শ	১৭
সংগঠন ও শৃঙ্খলা	১৭
সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা	১৮
পূর্ণতাদানকারী গুণাবলি	২০
আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা	২১
আখিরাতের চিন্তা	২১
চরিত্র মাধুর্য	২২
ধৈর্য	২৩
প্রজ্ঞা	২৫
মৌলিক ও অসৎ গুণাবলি	২৯
গর্ব ও অহংকার	২৯
বাঁচার উপায়	৩০
বন্দেগির অনুভূতি	৩০

আত্মবিচার	৩১
মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি	৩১
দলগত প্রচেষ্টা	৩২
প্রদর্শনেচ্ছা	৩২
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা	৩৪
সামষ্টিক প্রচেষ্টা	৩৪
ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত	৩৪
মানবিক দুর্বলতা	৩৭
আত্মপূজা	৩৭
আত্মপ্রীতি	৩৮
বাঁচার উপায়	৪০
তওবা ইস্তেগফার	৪০
সত্যের প্রকাশ	৪২
হিংসা ও বিদ্বেষ	৪২
কু-ধারণা	৪৩
গিবত	৪৪
চোগলখুরী	৪৫
কানাকানি ও ফিসফিসানি	৪৬
মেজাজের ভারসাম্যহীনতা	৪৯
একগুঁয়েমী	৫১
একদেশদর্শীতা	৫২
সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা	৫২
সংকীর্ণমনতা	৫৫
দুর্বল সংকল্প	৫৭

ব্যক্তিগত গুণাবলি

ইসলামের যথার্থ জ্ঞান

ব্যক্তিগত গুণাবলির মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ইসলামের যথার্থ জ্ঞান। যে ব্যক্তি ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করতে চায় তাকে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি কায়েম করতে চায় তা জানতে ও বুঝতে হবে। এ কাজের জন্য ইসলামের নিছক সংক্ষিপ্ত জ্ঞান যথেষ্ট নয়; বরং কমবেশি বিস্তারিত জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এর স্বল্পতা ও বিপুলতা মানুষের যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। এ জন্য এ পথের প্রত্যেকটি পথিককে এবং আন্দোলনের প্রত্যেকটি কর্মীকে মুফতি বা মুজতাহিদ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। তবে তাদের প্রত্যেককে অবশ্যই ইসলামের আকিদা বিশ্বাসকে জাহেলি চিন্তা ভাবনা ও ইসলামী কর্মপদ্ধতিকে জাহেলিয়াতের নীতি-পদ্ধতি থেকে আলাদা করে জানতে হবে এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ইসলাম মানুষকে কী পথ দেখিয়েছে সে সম্পর্কে অবগত হতে হবে। এ জ্ঞান ও অবগতি ছাড়া মানুষ নিজে সঠিক পথে চলতে পারে না, অন্যকেও পথ দেখাতে পারে না এবং সমাজ পরিগঠনের জন্য যথার্থ পথে কোনো কাজ করতেও সক্ষম হয় না। সাধারণ কর্মীদের মধ্যে এ জ্ঞান এমন পর্যায়ে থাকতে হবে যার ফলে, তারা গ্রাম ও শহরের লোকদের সহজভাবে দ্বীনের কথা বুঝাতে সক্ষম হবে। কিন্তু উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী কর্মীদের মধ্যে এ জ্ঞান অধিক মাত্রায় থাকতে হবে। তাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে। শিক্ষিত লোকদের সকল প্রকার সন্দেহ-সংশয় নিরসন করতে হবে। বিরুদ্ধবাদীদের প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ ও সন্তোষজনক জবাব দিতে হবে। ইসলামের আলোকে জীবনের বিভিন্ন সমস্যাবলীর সমাধান করতে হবে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা ও শিল্পকে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে বিন্যস্ত করতে হবে। ইসলামের অনাদী ও চিরন্তন ভিত্তির ওপর একটি নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাসাদ গড়ে তুলতে হবে। আধুনিক চিন্তা ও কর্মের

ত্রুটিপূর্ণ অংশকে ত্রুটিহীন অংশ থেকে আলাদা করার মতো সমালোচনার যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকতে হবে। এবং এই সঙ্গে যা কিছু ভাঙার তাকে ভেঙে ফেলে তদস্থলে উন্নততর বস্তু গড়ার এবং যা কিছু রাখার তাকে কায়েম রেখে একটি উত্তম ও উন্নততর ব্যবস্থায় তাকে ব্যবহার করার মতো গঠনমূলক যোগ্যতা ও শক্তির অধিকারী তাকে হতে হবে।

ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস

এ উদ্দেশ্য সম্পাদনে সচেষ্ট ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানের পর দ্বিতীয় যে অপরিহার্য গুণটি থাকতে হবে সেটি হচ্ছে– যে দ্বীনের ভিত্তিতে জীবনব্যবস্থা গড়ে তুলতে চায় তার ওপর নিজেকে অবিচল ঈমান রাখতে হবে। ওই জীবন ব্যবস্থার সত্যতা ও নির্ভুলতা সম্পর্কে তার নিজের মন নিঃসংশয় হতে হবে। এ ব্যাপারে তার নিজের চিন্তা পুরোপুরি একাগ্র হতে হবে। সন্দেহ, সংশয় ও দ্যোদুল্যমান অবস্থায় মানুষ এ কাজ করতে পারে না। মানসিক সংশয় এবং বিশৃঙ্খল চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। যে ব্যক্তির মন দ্যোদুল্যমান, যার চিন্তা একাগ্র নয়, চিন্তা ও কর্মের বিভিন্ন পথ যাকে বিভ্রান্ত করে অথবা করতে পারে, সে ধরনের কোনো লোক এ কাজের উপযোগী হতে পারে না। যে ব্যক্তি এ কাজ সম্পন্ন করবে তাকে নিঃসংশয় চিত্তে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করতে হবে এবং কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলি, ক্ষমতা ও অধিকারের ওপর অবিচল ঈমান আনতে হবে। তাকে আখিরাতের ওপর অটল বিশ্বাস রাখতে হবে এবং কুরআনে আখিরাতের চিত্র যেভাবে বর্ণিত হয়েছে হুবহু সেভাবে বিশ্বাস করতে হবে। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রদর্শিত পথই একমাত্র সত্য পথ এবং তার বিরোধী বা তার সাথে সামঞ্জস্যহীন প্রত্যেকটি পথই ভ্রান্ত। তাকে বিশ্বাস করতে হবে, মানুষের যেকোনো চিন্তা ও পদ্ধতি যাচাই করার একটি মাত্র মানদণ্ড আছে এবং তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। এ মানদণ্ডে যে উত্তীর্ণ হবে সে সত্য ও অভ্রান্ত আর যে উত্তীর্ণ হবে না, সে বাতিল ও ভ্রান্ত। ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের জন্য এ সত্যগুলোর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং চিন্তার পূর্ণ একাগ্রতা লাভ করতে হবে। যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে

সামান্য দ্যোদুল্যমান অবস্থায় বিরাজ করে অথবা এখনো অন্যান্য পথের প্রতি আগ্রহশীল তার এ প্রাসাদের কারিগর হিসেবে অগ্রসর হওয়ার আগে নিজের এ দুর্বলতার চিকিৎসা প্রয়োজন।

চরিত্র ও কর্ম

তৃতীয় অপরিহার্য গুণটি হচ্ছে, কাজ কথা অনুযায়ী হতে হবে। যে বস্তুকে সে সত্য মনে করে তার অনুসরণ করবে, যাকে বাতিল গণ্য করে তা থেকে দূরে সরে যাবে, যাকে নিজের দ্বীন ঘোষণা করে তাকে নিজের চরিত্র ও কর্মের দ্বীনে পরিণত করবে এবং যে বস্তুর দিকে সে বিশ্ববাসীদের আহ্বান জানায় সর্বপ্রথম সে নিজে তার আনুগত্য করবে। সৎ কাজে আনুগত্য এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তাকে বাইরের কোনো চাপ প্রভাবের মুখাপেক্ষী হওয়া উচিত নয়। কোনো কাজ করলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যাবে, কেবল এতোটুকু কারণেই তার আন্তরিক আগ্রহ ও ইচ্ছা সহকারে ওই কাজ সম্পন্ন করা উচিত। আবার কোনো কাজ নিছক আল্লাহর নিকট অপছন্দ হওয়ার কারণেই সে তা থেকে বিরত থাকবে। তার এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট কেবল সাধারণ অবস্থায় হওয়া উচিত নয়; বরং তার চারিত্রিক শক্তি এতই উন্নত পর্যায়ের হতে হবে যে, অস্বাভাবিক বিকৃত পরিবেশে তাকে সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবিলা করে এবং সব রকম বিরোধিতা ও প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও সত্য পথে অবিচল থাকতে হবে। যার মধ্যে এ গুণ নেই সে সমাজ সংস্কার ও পরিগঠনের কাজে সাহায্যকারী হতে পারে কিন্তু সে প্রকৃত কর্মী হতে পারে না। ইসলামের জন্য যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে সামান্যতম ভক্তি ও শ্রদ্ধা রাখে সে এ কাজে সাহায্যকারী হতে পারে। এমনকী যে ব্যক্তি ইসলামের অস্বীকারকারী ও তার বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিতে তৎপর নয়, সেও অনেকটা এর সহায়ক হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের কোটি কোটি সাহায্যকারী থাকলেও কার্যত ইসলামীব্যবস্থা প্রবর্তিত হতে পারে না এবং জাহেলিয়াতের বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধনের গতি রুদ্ধ হতে পারে না। কার্যত এ কাজ একমাত্র তখনই সম্পাদিত হতে পারে, যখন এর জন্য এমন একদল লোক সামনে অগ্রসর হবে যারা জ্ঞান ও বিশ্বাসের সাথে চরিত্র ও কর্মশক্তি সমন্বিত হবে এবং যাদের ঈমান ও বিবেক

এত বিপুল জীবনী-শক্তির ধারক হবে যার ফলে বাইরের কোনো উসকানি ছাড়াই নিজেদের অভ্যন্তরীণ তাকিদে তার দ্বীনের চাহিদা ও দাবি পূরণ করতে থাকবে। এ ধরনের কর্মীরা যদি ময়দানে নেমে আসে তাহলে মুসলিম সমাজে এমনকী অমুসলিম সমাজেও সর্বত্র যে বিপুল সংখ্যক সমর্থক ও সাহায্যকারী পাওয়া যায় তাদের উপস্থিতিও ফলপ্রসূ হতে পারে।

দ্বীন হচ্ছে জীবনোদ্দেশ্য

সমাজ সংস্কার ও পরিগঠনে সচেষ্ট কর্মীদের মধ্যে এ তিনটি গুণাবলির সাথে সাথে আরও একটি গুণ থাকতে হবে। তা হলো আল্লাহর বাণী বুলন্দ করা এবং দ্বীনের প্রতিষ্ঠা নিছক তাদের জীবনের একটি আকাঙ্ক্ষার পর্যায়ভূক্ত হবে না; বরং এটিকে তাদের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করতে হবে। এক ধরনের লোক দ্বীন সম্পর্কে অবগত হয়, তার ওপর ঈমান রাখে এবং সেই অনুযায়ী কাজ করে কিন্তু তার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম তাদের জীবনের লক্ষ্য বিবেচিত হয় না; বরং সততা ও সৎকর্ম করে এবং এই সঙ্গে নিজেদের দুনিয়ার কাজ কারবারে লিপ্ত থাকে। নিঃসন্দেহে এরা সৎ লোক। ইসলামী জীবনব্যবস্থা কার্যত প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে এরা তার ভালো নাগরিকও হতে পারে। কিন্তু যেখানে জাহেলি জীবনব্যবস্থা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে রাখে এবং তাকে সরিয়ে তদস্থলে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন দেখা দেয় সেখানে নিছক এ ধরনের সৎলোকদের উপস্থিতি কোনো কাজে আসে না; বরং সেখানে এমন সব লোকের প্রয়োজন হয় যাদের জীবনোদ্দেশ্যরূপে এ কাজ বিবেচিত হয়। দুনিয়ার অন্যান্য কাজ তারা অবশ্যই করবে কিন্তু তাদের জীবন একমাত্র এ উদ্দেশ্যের চারিদিকে আবর্তন করবে। এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য তারা হবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এ জন্য নিজেদের সময়-সামর্থ্য, ধন-মাল ও দেহ-প্রাণের সকল শক্তি এবং মন মস্তিষ্কের পরিপূর্ণ যোগ্যতা ব্যয় করতে তারা প্রস্তুত হবে। এমনকী যদি জীবন উৎসর্গ করার প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে তাতেও তারা পিছপা হবে না। এ ধরনের লোকেরাই জাহেলিয়াতের আগাছা কেটে ইসলামের পথ পরিস্কার করতে পারে।

দ্বীনের সঠিক নির্ভুল জ্ঞান, তার প্রতি অটল বিশ্বাস, সেই অনুযায়ী চরিত্র গঠন

এবং তার প্রতিষ্ঠাকে জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করা এগুলো এমন সব মৌলিক গুণ যেগুলো ব্যক্তিগতভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টারত প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে থাকা উচিত। এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ এ গুণাবলির অধিকারী ব্যক্তিবর্গের সমাবেশ ছাড়া এ কাজ সম্পাদনের কল্পনাই করা যেতে পারে না।

বলাবাহুল্য, এহেন ব্যক্তিরা যদি সত্যিই কিছু করতে চায় তাহলে তাদের একটি দলভুক্ত হয়ে এ কাজ করা অপরিহার্য। তারা যেকোনো দলভুক্ত হোক এবং যেকোনো নামে কাজ করুক না কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। প্রত্যেক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি জানে, নিছক ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সমাজব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন আনা যেতে পারে না। এজন্য বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা নয়, সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। কাজেই একে একটি সর্ববাদী সম্মত সত্য মনে করে এখন আমরা এ ধরনের দলের মধ্যে দলীয় যে সব গুণ থাকা অপরিহার্য সেগুলোর আলোচনায় প্রবৃত্ত হব।

দলীয় গুণাবলি

ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা

এ ধরনের দলের মধ্যে সর্বপ্রথম যে গুণটি থাকতে হবে তা হচ্ছে, তার অর্ন্তভূক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রাসাদের প্রত্যেকটা ইট মজবুতভাবে একটার সাথে আরেকটা মিশে থাকলে তবে প্রাসাদটি মজবুত হয়। সিমেন্ট এ ইটগুলোকে পরস্পরের সাথে মিশিয়ে রাখে। তেমনিভাবে কোনো দলের সদস্যদের অন্তর পরস্পরের সাথে একসূত্রে গ্রথিত থাকলে তবেই তা ইস্পাত প্রাচীরে পরিণত হয়। আর এ অন্তরসমূহকে একসূত্রে গ্রথিত করতে পারে আন্তরিক ভালোবাসা, পারস্পারিক কল্যাণাকাঙ্ক্ষা, সহানুভূতি ও পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার। ঘৃণাকারী অন্তর কখনো পরস্পরে মিলেমিশে থাকতে পারে না। মুনাফেকি ধরনের মেলামেশা কখনো সত্যিকার ঐক্য সৃষ্টি করতে পারে না। স্বার্থবাদী ঐক্য মুনাফেকির পথ প্রশস্ত করে। আর নিছক একটি শুষ্ক-নিরস ব্যবসায়িক সম্পর্ক কোনো সৌহার্দ ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিণত হতে পারে না। কোনো পার্থিব স্বার্থ এ ধরনের সম্পর্কহীন লোকদের একত্রিত করলেও তারা নিছক বিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্যই একত্রিত হয় এবং কোনো মহৎ কাজ সম্পাদনের পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে হানাহানী করেই শেষ হয়ে যায়। যখন একদল নিঃস্বার্থ চিন্তার অধিকারী ও জীবনোদ্দেশ্যের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী লোক একত্রিত হয় অতঃপর চিন্তার এই নিঃস্বার্থতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি এ অনুরাগ তাদের নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে কেবল তখনই একটি মজবুত ও শক্তিশালী দলের সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের দল আসলে ইস্পাত প্রাচীরের ন্যায় অটুট হয়। শয়তান এর মধ্যে ফাটল ধরাবার কোনো পথই পায় না। আর বাহির থেকে বিরোধিতার তুফান এনে এর বিরুদ্ধে দাঁড় করালেও একে স্থানচ্যুত করতে পারে না।

পারস্পরিক পরামর্শ

দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় গুণ হচ্ছে, এ দলকে পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং পরামর্শের নিয়ম-নীতি পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। যে দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো চলে এহেন স্বেচ্ছাচারী দল আসলে কোনো দল হয় না; বরং নিছক একটি জনমণ্ডলী। এহেন জনমণ্ডলী কোনো কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় না। অনুরূপভাবে যে দলের এক ব্যক্তি বা কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তির একটি গ্রুপ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসে এবং বাদ বাকি সবাই তার ইঙ্গিতে পরিচালিত হয় এহেন দলও বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। একমাত্র পরামর্শের মাধ্যমে প্রতিটি বিষয়ের ভালো-মন্দ দিকগুলো পর্যালোচনা করে একটি ভালো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে; বরং এর মাধ্যমে আরও দুটি ফায়দাও হাসিল হয়।

এক. যে কাজের পেছনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমগ্র দলের পরামর্শ কার্যকর থাকে সমগ্র দল মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে একথা কেউ চিন্তা করে না যে, ওপর থেকে কোনো বস্তু তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুই. এভাবে সমগ্র দল সমস্যা ও ঘটনাবলী অনুধাবন করার শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি দল ও তার কাজের প্রতি আগ্রহ পোষণ করে এবং তার পক্ষ থেকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহকে নিজের সিদ্ধান্ত মনে করে। কিন্তু এজন্য শর্ত হচ্ছে, পরামর্শের নিয়ম-নীতি পালন করে চলতে হবে। আর পরামর্শের নিয়মনীতি হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তি ঈমানদারীর সাথে নিজের মত পেশ করবে এবং মনের মধ্যে কোনো কথা লুকিয়ে রাখবে না। আলোচনায় কোনো প্রকার জিদ, হঠধর্মিতা ও বিদ্বেষের আশ্রয় নেবে না। এবং সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে যাওয়ার পর ভিন্ন মতের অধিকারীরা নিজেদের মত পরিবর্তন না করলেও দলীয় সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য সানন্দে অগ্রসর হবে। এ তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখলে পরামর্শের সমস্ত উপকারিতা নষ্ট হয়ে যায়; বরং এটিই পরিশেষে দলের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি করে।

সংগঠন ও শৃঙ্খলা

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে, সংগঠন, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা, পারস্পারিক সহযোগিতা ও একটি টিমের ন্যায় কাজ করা। একটি দল তার সব রকমের

গুণাবলি সত্ত্বেও কেবল নিজের সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনাসমূহ কার্যকর করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে ব্যর্থ হয়ে যায়। আর এটি হয় সংগঠন, শৃঙ্খলা ও সহযোগিতার অভাবের ফলশ্রুতি। ধ্বংসমূলক কাজ নিছক হই-হাঙ্গামার সাহায্যেও সমাধা হতে পারে। কিন্তু কোনো গঠনমূলক কাজ সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। সমগ্র দলের একযোগে দল কর্তৃক গৃহীত নিয়ম-নীতির অনুসারী হওয়ার নামই হচ্ছে সংঘদ্ধ প্রচেষ্টা। দলের মধ্যে কোনো ব্যক্তিকে যে পর্যায়ের কর্তৃত্বশীল করা হয় তার নির্দেশাবলী মেনে চলতে হবে। দলের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কর্তব্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং তার ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যথাসময়ে নিষ্ঠার সাথে তা সম্পাদন করার চেষ্টা করতে হবে। যে কর্মীদের ওপর সম্মিলিতভাবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয় তাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা থাকতে হবে। দলের মেশিন এমন পর্যায়ে সক্রিয় হতে হবে যে, একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই তাকে কার্যকর করার জন্য তার সকল কল-কব্জা চালু হয়ে যাবে। দুনিয়ায় এ ধরনের দলই কোনো কাজ সম্পন্ন করতে পারে। অন্যথায় যেসব দল কল-কব্জা সংগ্রহ করে কিন্তু সেগুলো যথাস্থানে সংযোজিত করে যথারীতি মেশিনের মতো চালানোর ব্যবস্থা করেনি তাদের থাকা না থাকা সমান হয়ে দাঁড়ায়।

সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা

সর্বশেষ ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে, দলের মধ্যে সংস্কারের উদ্দেশ্যে সমালোচনা করার যোগ্যতাও দলের থাকতে হবে। অন্ধ অনুসারী ও সরলমনা ভক্তবৃন্দ যতই সঠিক স্থান থেকে কাজ শুরু করুক না কেন এবং যতই নির্ভুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখে অগ্রসর হোক না কেন, অবশেষে তারা সমগ্র কাজ বিকৃত করে যেতে থাকে। কারণ, মানবিক কাজে দুর্বলতার প্রকাশ স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেখানে দুর্বলতার প্রতি নজর রাখার কেউ থাকে না অর্থাৎ তা চিহ্নিত করা দোষরূপে বিবেচিত হয় না, সেখানে গাফিলতি বা অক্ষমতা পূর্ণ নিরবতার কারণে সব রকমের দুর্বলতা, নিরুদ্বেগ ও নিশ্চিন্ততার আশ্রয়স্থলে পরিণত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তা দ্বিগুণ, চর্তুগুণে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দলের সুস্থ-সবল অবয়ব ও রোগমুক্ত দেহের জন্য সমালোচনার অভাবের চাইতে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। আর সমালোচনামূলক চিন্তাকে দাবিয়ে দেওয়ার চাইতে দলের জন্য বড়ো অকল্যাণাকাঙ্ক্ষা আর কিছুই হতে পারে

না। এ সমালোচনার মাধ্যমেই দোষ-ত্রুটি যথাসময়ে প্রকাশিত হয় এবং তার সংশোধনের চেষ্টা চালানো যায়। কিন্তু সমালোচনার অপরিহার্য শর্ত এই যে, তা দোষ দেখানোর উদ্দেশ্যে হতে পারবে না; বরং পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে সংশোধনের উদ্দেশ্যে হতে হবে। এবং এই সঙ্গে দ্বিতীয় সমান গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে সমালোচনাকারীকে যথার্থ সমালোচনার পদ্ধতিতে সমালোচনা করতে হবে। একজন দোষ সন্ধানকারী সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত সমালোচকের বেয়াড়া, বেকায়দা, অসময়োচিত ও বাজে সমালোচনাও দলকে ঠিক একই পর্যায়ের ক্ষতির সম্মুখীন করতে পারে।

পূর্ণতাদানকারী গুণাবলি

এ পর্যন্ত আমরা সমাজ সংশোধন ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের অপরিহার্য গুণাবলি আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো নিছক প্রারম্ভিক ও মৌলিক গুণাবলির পর্যায়ভুক্ত। কোনো ব্যাবসা শুরু করতে হলে যেমন একটা সর্বনিম্ন পুঁজির প্রয়োজন হয়, যা না হলে ওই ব্যাবসা শুরু করাই যেতে পারে না। তেমনি এ গুণাবলি হচ্ছে ব্যক্তির সর্বনিম্ন নৈতিক পুঁজি, এগুলো ছাড়া সমাজ সংশোধন ও ইসলামী জীবনব্যবস্থা পরিগঠনের কাজ শুরু করাই যেতে পারে না। বলাবাহুল্য যেসব লোক নিজেরা ইসলাম সম্পর্কে অবগত নয় বা এ ব্যাপারে মানসিক নিশ্চিন্ততা ও একাগ্রতা লাভ করতে পারেনি অথবা তাকে নিজেদের চরিত্র, কর্ম ও বাস্তব জীবনের ধর্মে পরিণত করতে সক্ষম হয়নি বা ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নিজেদের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করেনি, তাদের দ্বারা কোনো ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তাই করা যায় না। অনুরূপভাবে যদি অভিপ্সীত গুণাবলি সমন্বিত ব্যক্তিবর্গের নিছক সমাবেশ হয় কিন্তু তাদের অন্তর পরস্পরের সাথে সংযুক্ত না হয়, তাদের মধ্যে সহযোগিতা শৃঙ্খলা ও সংগঠন না থাকে, তারা এক সাথে মিলেমিশে কাজ করার রীতিতে অভ্যস্ত না থাকে এবং পারস্পরিক পরামর্শ ও সমালোচনার যথার্থ পদ্ধতি সম্পর্কে যদি তারা অজ্ঞ থাকে, তাহলে তাদের নিছক সমাবেশ কোনো প্রকার ফলপ্রসূ হতে পারে না। কাজই এ কথা ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, ইতঃপূর্বে আমি যে চারটি ব্যক্তিগত ও চারটি সামষ্টিক গুণাবলির উল্লেখ করে এসেছি সেগুলোই হচ্ছে এ কাজ শুরু করার প্রাথমিক পুঁজি এবং একমাত্র এ প্রেক্ষিতেই সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ কাজের বিকাশ ও সাফল্যের জন্য নিছক এতটুকু নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুঁজি যথেষ্ট-এ ধারণা যথার্থ নয়। এখন আমরা অপরিহার্য গুণাবলির আলোচনা করব।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা

এ গুণাবলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা। দুনিয়ার অন্যান্য কাজ ব্যক্তি, পরিবার, গোত্র, জাতি বা দেশের জন্য করা যেতে পারে, ব্যক্তিস্বার্থ ও ব্যক্তিগত লাভের যাবতীয় দিক সম্ভাবনা সহকারে সম্পাদন করা যেতে পারে, আল্লাহ বিশ্বাসই নয়, আল্লাহকে অস্বীকার করেও করা যেতে পারে এবং এর ভেতর সব রকম পার্থিব সাফল্য লাভের সম্ভাবনাও রয়েছে। কিন্তু ইসলামী জীবনব্যবস্থা কায়েম করা একটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কাজ। যে পর্যন্ত মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর সাথে যথার্থ শক্তিশালী ও গভীর না হয় এবং সে একমাত্র আল্লাহর জন্য কাজ করতে মনস্থ না করে সে পর্যন্ত এ কাজে কোনো প্রকার সাফল্য সম্ভব নয়। কারণ, এখানে মানুষ আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করতে চায়। আর এ জন্য সবকিছু আল্লাহর জন্য করা প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কাজে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিই কাম্য হতে হবে। একমাত্র আল্লাহপ্রীতিই এ কর্মের মূল প্রেরণা হতে হবে। তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের ওপর পূর্ণ আস্থা থাকতে হবে। তাঁরই নিকট থেকে পুরস্কারের আশা থাকতে হবে। এবং তাঁরই নিকট জবাবদিহির ভয়ে সমগ্র মন আচ্ছন্ন থাকতে হবে। এছাড়া আর কোনো ভয়, লোভ-লালসা প্রীতি ও আনুগত্যের মিশ্রণ এবং অন্য যে কোনো স্বার্থের অন্তর্ভুক্তি এ কাজকে যথার্থ পথ থেকে বিচ্যুত করবে এবং এর ফলে অন্যকিছু কায়েম হতে পারে কিন্তু আল্লাহর দ্বীন কায়েম হতে পারে না।

আখিরাতের চিন্তা

এ প্রথোমোক্ত গুণটির সাথে নিকট সম্পর্কযুক্ত দ্বিতীয় গুণটি হচ্ছে, আখিরাতের চিন্তা। যদিও দুনিয়াই মুমিনের কর্মস্থল এবং সবকিছু তাকে এখানেই করতে হয়। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও সে এ দুনিয়ার জন্য কাজ করে না; বরং আখিরাতের জন্য করে এবং দুনিয়ার ফলাফলের দিকে তার লক্ষ্য থাকে না; বরং তার লক্ষ্য থাকে আখিরাতের ফলাফলের প্রতি। যেসব কাজ আখিরাতে লাভজনক সেসব তাকে করতে হবে এবং যেসব কাজের ফলে আখিরাতের কোনো লাভ হবে না সেগুলো তাকে ত্যাগ করতে হবে। দুনিয়ার যেসব লাভ আখিরাতে ক্ষতিকর সেগুলো তাকে বর্জন করতে হবে আর দুনিয়ার যেসব ক্ষতি আখিরাতে

লাভজনক সেগুলো তাকে গ্রহণ করতে হবে। তাকে একমাত্র আখিরাতের শান্তি ও পুরস্কারের চিন্তা করতে হবে। দুনিয়ার কোনো শান্তি ও পুরস্কারের গুরুত্ব তার চোখে থাকা উচিত নয়। এ দুনিয়ায় তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হোক বা না হোক, সে সফলতা বা ব্যর্থতা যারই সম্মুখীন হোক, সকল অবস্থায় তাকে এ বিশ্বাস নিয়ে কাজ করা উচিত যে, যে আল্লাহর জন্য সে এ পরিশ্রম করছে তাঁর দৃষ্টি থেকে কিছুই প্রচ্ছন্ন নেই এবং তাঁর নিকট আখিরাতের চিরন্তন পুরস্কার পাওয়া থেকে সে কোনোক্রমেই বঞ্চিত হবে না এবং সেখানকার সাফল্যই হচ্ছে আসল সাফল্য। এ মানসিকতা ছাড়া এ পথে মানুষের পক্ষে নির্ভুল লক্ষ্য এর দিকে এক পা অগ্রসর হওয়াও সম্ভব নয়। দুনিয়ার স্বার্থের সামান্যতম মিশ্রণ এর মধ্যে থাকলে এখানে পদস্খলন ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাফল্যকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পরিণত করে অগ্রসর হয় আল্লাহর পথে একটি না হলেও দু-চারটি আঘাতেই সে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে। দুনিয়ার স্বার্থ যার মনে স্থান লাভ করে এ পথের যেকোনো সাফল্য কোনো না কোনো পর্যায়ে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনে।

চরিত্র মাধুর্য

চরিত্র মাধুর্য উপরোক্ত গুণটির প্রভাবকে কার্যত একটি বিরাট বিজয়ী শক্তিতে পরিণত করে। আল্লাহর পথে যারা কাজ করে তাদের উদার হৃদয় ও বিপুল হিম্মতের অধিকারী হতে হবে, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিশীল ও মানবতার দরদি হতে হবে। তাদের হতে হবে ভদ্র ও কোমল স্বভাবসম্পন্ন, আত্মনির্ভরশীল ও কষ্টসহিষ্ণু, মিষ্টভাষী ও সদালাপী। তাদের দ্বারা কোনো ক্ষতি হবে এমন কোনো ধারণাও যেন কেউ পোষণ করতে না পারে এবং তাদের নিকট থেকে কল্যাণ ও উপকার সবাই কামনা করবে। তারা নিজেদের প্রাপ্যের চাইতে কমের ওপর সন্তুষ্ট থাকবে এবং অন্যকে তার প্রাপ্যের চাইতে বেশি দিতে প্রস্তুত থাকবে। তারা মন্দের জবাব ভালো দিয়ে দেবে অথবা কমপক্ষে মন্দ দিয়ে দেবে না। তারা নিজেদের দোষ-ত্রুটি স্বীকার করবে এবং অন্যের গুণাবলির কদর করবে। তারা অন্যের দুর্বলতার প্রতি নজর না দেওয়ার মতো বিরাট হৃদয়পটের অধিকারী হবে, অন্যের দোষ-ত্রুটি ও বাড়াবাড়ি মাফ করে দেবে এবং নিজের জন্য কারোর ওপর প্রতিশোধ নেবে না। তারা অন্যের

সেবা গ্রহণ করে নয়; বরং অন্যকে সেবা করে আনন্দিত হবে। তারা নিজের স্বার্থে নয়; বরং অন্যের ভালোর জন্য কাজ করবে। কোনো প্রকার প্রশংসার অপেক্ষা না করে এবং কোনো প্রকার নিন্দাবাদের তোয়াক্কা না করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারও পুরস্কারের প্রতি দৃষ্টি দেবে না। তাদের বল প্রয়োগে দমন করা যাবে না। ধন-সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে না কিন্তু সত্য ও ন্যায়ের সামনে তারা নির্দ্বিধায় ঝুঁকে পড়বে। তাদের শত্রুরাও তাদের ওপর এ বিশ্বাস রাখবে যে, কোনো অবস্থায় তারা ভদ্রতা ও ন্যায়-নীতি বিরোধী কোনো কাজ করবে না। এ চারিত্রিক গুণাবলি মানুষের মন জয় করে নেয়। এগুলো তলোয়ারের চাইতে ধারালো এবং হীরা, মণি-মুক্তার চাইতেও মূল্যবান। যে এহেন চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনকারী সে তার চারপাশের জনবসতির ওপর বিজয় লাভ করে। কোনো দল পূর্ণাঙ্গরূপে এ গুণাবলির অধিকারী হয়ে কোনো মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা চালালে দেশের পর দেশ তার করতলগত হতে থাকে এবং দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাকে পরাজিত করতে সক্ষম হয় না।

ধৈর্য

এই সঙ্গে আর একটি গুণও সংযুক্ত আছে, তাকে সাফল্যের চাবিকাঠি বলা যায়। সেটি হচ্ছে ধৈর্য। ধৈর্যের বহু অর্থ হয় এবং আল্লাহর পথে যারা কাজ করে তাদের এর প্রত্যেকটি অর্থের প্রেক্ষিতেই ধৈর্যশীল হতে হয়।

ধৈর্যের একটি অর্থ হচ্ছে তাড়াহুড়ো না করা, নিজের প্রচেষ্টার ত্বড়িৎ ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি সারাজীবন একটি উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য অনবরত পরিশ্রম করতে থাকে এবং একের পর এক ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়েও পরিশ্রম থেকে বিরত হয় না। মানুষের সংশোধন ও পরিগঠনের কাজ অন্তহীন ধৈর্যের মুখাপেক্ষী। বিপুল ধৈর্য ছাড়া কোনো ব্যক্তি এ কাজ সম্পাদনে সক্ষম হয় না।

ধৈর্যের দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ধৈর্যশীল ব্যক্তি একবার ভেবেচিন্তে যে পথ অবলম্বন করে তার ওপর অবিচল থাকে এবং একাগ্র ইচ্ছা ও সংকল্পের পূর্ণ শক্তি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

ধৈর্যের আর একটি অর্থ হচ্ছে বাঁধা বিপত্তির বিরোচিত মোকাবিলা করা এবং শান্তচিত্তে লক্ষ্য অর্জনের পথে যাবতীয় দুঃখ কষ্ট বরদাশত করা। ধৈর্যশীল ব্যক্তি যে কোনো ঝড়-ঝনঝার পর্বত প্রমাণ তরঙ্গাঘাতে হিম্মতহারা হয়ে পড়ে না।

দুঃখ-বেদনা, ভরাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়াও ধৈর্যের একটি অর্থ। যে ব্যক্তিকে সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের খাতিরে কিছু অপরিহার্য ভাঙার কাজও করতে হয়, বিশেষ করে যখন দীর্ঘকালের বিকৃত সমাজে তাকে এ কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তখন অবশ্যই তাকে বড়ই নিম্নস্তরের হীন ও বিশ্রী রকমের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। যদি সে গাল খেয়ে হাসবার ও নিন্দাবাদ হজম করার ক্ষমতা না রাখে এবং দোষারোপ ও মিথ্যা প্রোপাগান্ডাকে নির্বিবাদে এড়িয়ে গিয়ে স্থির চিত্তে ও ঠান্ডা মস্তিষ্কে নিজের কাজে ব্যস্ত না থাকতে পারে, তাহলে এ পথে পা না বাড়ানোই তার জন্য উত্তম কারণ এ পথে কাঁটা বিছানো। এর প্রত্যেকটি কাঁটা এই দৃঢ় মনোবল নিয়ে মুখ উঁচিয়ে আছে যে, মানুষ অন্য যে কোনোদিকে নির্বিঘ্নে অগ্রসর হতে পারে কিন্তু এ দিকে তাকে এক ইঞ্চিও এগিয়ে আসতে দেওয়া হবে না। এ অবস্থায় যে ব্যক্তি কাপড়ের প্রত্যেকটি কাঁটা ছাড়াতে ব্যস্ত হবে সে কেমন করেই বা অগ্রসর হবে? এ পথে এমন সব লোকের প্রয়োজন যারা নিজেদের কাপড়ে কোনো কাঁটা বিধলে কাপড়ের সে অংশটি ছিড়ে কাঁটাগাছের গায়ে রেখে দিয়ে নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকবে। কেবল বিরোধীদের মোকাবিলায় এ ধৈর্যের প্রয়োজন হয় না; বরং অনেক সময় এ পথের পথিকের নিজের সহযোগীদের তিক্ত ও বিরক্তিকর বাক্যবাণেও বিদ্ধ হতে হয় এবং তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় না দিলে সমগ্র কাফেলা পথভ্রষ্ট হতে পারে।

ধৈর্যের এক অর্থ হচ্ছে, সকল প্রকার ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবিলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা, শয়তানের উৎসাহ প্রদান ও নফসের খায়েশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। হারাম থেকে দূরে থাকা ও আল্লাহর নির্দেশিত সীমার মধ্যে অবস্থান করা, গুনাহর পথে যাবতীয় আরাম-আয়েশ, লাভ প্রত্যাখান করা এবং নেকি ও সততার পথে সকল প্রকার ক্ষতি ও বঞ্চনাকে সাদরে বরণ করা। দুনিয়াপুঁজারীদের আরাম-আয়েশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও তার প্রতি লোভ না করা এবং এ জন্য সামান্য আপেক্ষা না করা।

দুনিয়ার স্বার্থ উদ্ধারের পথ প্রশস্ত দেখে এবং সাফল্যের সুযোগ-সুবিধা নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও পূর্ণ মানসিক নিশ্চিন্ততার সাথে একমাত্র নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে লব্ধ দানের ওপর সন্তুষ্ট থাকার নাম ধৈর্য।

উপরোক্ত সকল অর্থেই ধৈর্য হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি। কাজেই আমাদের কাজের মধ্যে যেকোনো দিক দিয়ে ধৈর্যহীনতা দেখা দিলে অবশ্য আমাদের তার কুফলের সম্মুখীন হতে হবে।

প্রজ্ঞা

এসব গুণের পাশাপাশি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ হচ্ছে প্রজ্ঞা। কাজের বেশি সাফল্য এরই ওপর নির্ভরশীল। দুনিয়ায় যেসব জীবনব্যবস্থা কায়েম রয়েছে উন্নত পর্যায়ের বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাশীল লোকেরাই সেগুলো চালাচ্ছে। তাদের পেছনে ব্যক্তিগত উপায়-উপকরণের সাথে সাথে বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষমতাও কাজ করছে। এগুলোর মোকাবিলায় আর একটি জীবনব্যবস্থা কায়েম করা এবং সাফল্যের সাথে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নেহায়েত ছেলেখেলা নয়। নিছক বিসমিল্লাহর গম্বুজে যাদের বসবাস এ কাজ তাদের দ্বারা সাধিত হওয়া সম্ভব নয়। সরলমনা, চিন্তা ও তীক্ষবুদ্ধি বিবর্জিত লোকেরা যতই সৎ নেক-দিল হোক না কেন, এ কাজ তাদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ জন্য গভীর দৃষ্টি, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তির প্রয়োজন। এ কাজ একমাত্র তাদের দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে যারা পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, বিচার-বিবেচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রাখে এবং জীবন সমস্যা বুঝার ও সমাধানের যোগ্যতা রাখে। এসব গুণকেই এক কথায় প্রজ্ঞা বলা যায়। বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও প্রকাশের ওপর এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হচ্ছে মানবিক মনস্তত্ব অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী মানুষের সাথে ব্যবহার করা এবং মানুষের মনের ওপর নিজের দাওয়াতের প্রভাব বিস্তার করে তাকে লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত করার পদ্ধতি অবগত হওয়া। প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই পেটেন্ট ওষুধ না দিয়ে; বরং প্রত্যেকের মেজাজ ও রোগ নির্ণয় করে চিকিৎসা করা। প্রত্যেককে একই লাঠি দিয়ে হাঁকিয়ে না

দিয়ে; বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, শ্রেণি ও দলের বিশেষ অবস্থা অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী তাদের সাথে ব্যবহার করা।

নিজের কাজ ও তা সম্পাদন করার পদ্ধতি জানা এবং তার পথে আগত যাবতীয় বাঁধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা-বিরোধিতার মোকাবিলা করাও প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি। তাকে নির্ভুলভাবে জানতে হবে যে, যে উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা সফল করার জন্য তাকে কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে এবং কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা কীভাবে দূর করতে হবে।

পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা, সময়-সুযোগ অনুধাবন করা এবং কোন সময়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, এসব জানাও প্রজ্ঞারই পরিচয়। অবস্থা না বুঝেই অন্ধের মতো পা বাড়িয়ে দেওয়া, অসমায়োচিত কাজ করা, কাজের সময় ভুল করা গাফেল ও বুদ্ধিবিবেচনাহীন ব্যক্তির কাজ। এ ধরনের লোকেরা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য যতই সততা ও সৎ সংকল্পের সাথে কাজ করুক না কেন তারা কোনো ক্রমেই কামিয়াব হতে পারে না।

দ্বীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও দুনিয়ার কাজ-কারবারের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ম দূরদৃষ্টি রাখাই হচ্ছে সবচাইতে বড়ো প্রজ্ঞার পরিচয়। নিছক শরিয়তের বিধিনিষেধ ও মাসায়েল অবগত হয়ে উপস্থিত ঘটনাবলীকে সে দৃষ্টিতে বিচার করা মুফতির জন্য যথেষ্ঠ হতে পারে। কিন্তু বিকৃত সমাজের সংশোধন ও জীবনব্যবস্থাকে জাহেলিয়াতের ভিত্তি থেকে সমূলে উৎপাটিত করে দ্বীনের ভিত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য যথেষ্ঠ হতে পারে না। এ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য বিধি-নিষেধের খুঁটিনাটি দিকের সাথে তার মূলগত দিকের (বরং পরিপূর্ণ দ্বীনি ব্যবস্থার) ওপর নজর রাখতে হবে। ওপরন্তু বিধি-নিষেধের সাথে সাথে সেগুলোর কারণ, যৌক্তিকতা ও ফলাফল সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল হতে হবে এবং যেসব সাময়িক পরিস্থিতি ও সমস্যাকে সে দৃষ্টিতে বিচার করতে হবে সেগুলোও বুঝতে হবে।

অভিপ্সীত গুণাবলির এ বিরাট ফিরিস্তি দেখে আপাত দৃষ্টিতে মানুষ ভীত হয়ে পড়ে এবং চিন্তা করতে থাকে যে, আল্লাহর কামেল বান্দাহ ছাড়া তো এ কাজ আর কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে এত বিচিত্র ও বিপুল গুণের সমাবেশ কেমন করে সম্ভব। এ ভুল ধারণা নিরসনের জন্য

অবশ্যই একথা জানা প্রয়োজন যে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যেকটি গুণ পরিপূর্ণরূপে পাওয়া সম্ভব নয় এবং কোনো ব্যক্তির মধ্যে প্রথম পদেক্ষেপই তা পূর্ণ অনুশীলিত আকারে বিদ্যমান থাকাও জরুরি নয়। আমি একথা বলে বুঝাতে চাচ্ছি যে, যারা এ কাজ করতে অগ্রসর হবে তারা নিছক জাতি সেবার একটি কাজ মনে করে গতানুগতিক পদ্ধতিতে অগ্রসর হবে না; বরং নিজের মনোজগত পর্যালোচনা করে কাজ সম্পাদনের জন্য যে গুণাবলির প্রয়োজন তার উপাদান তার মধ্যে আছে কি-না তা জানার চেষ্টা করবে। উপাদান থাকলে কাজ শুরু করার জন্য যথেষ্ঠ। তাকে লালন করা ও নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী যথাসম্ভব অধিক উন্নত করা পরবর্তী পর্যায়সমূহের সাথে সম্পর্কিত। বীজ থেকে অঙ্কুরিত একটি ছোট্ট চারাগাছ মাটির গভীরে শিকড় পৌঁছিয়ে দেওয়ার পর ধীরে ধীরে খাদ্য সংগ্রহ করে বিরাট মহিরুহে পরিণত হয়। কিন্তু যদি বীজেরই অস্তিত্ব না থাকে তাহলে সেখানে কিছুই হতে পারে না। অনুরূপ ভাবে অভিপ্সীত গুণাবলির উপাদান যদি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে উপযুক্ত প্রচেষ্টা সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তা পূর্ণতার পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। কিন্তু যদি আদতে উপাদানই না থাকে তাহলে প্রচেষ্টা সাধনার মাধ্যমে কোনো প্রকার গুণাগুণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়।

এ পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, সংশোধন ও পরিগঠনের জন্য একটি নির্ভুল কর্মসূচির যতটা প্রয়োজন তার চাইতে কয়েকগুণ বেশি প্রয়োজন এ কাজের উপযোগী নৈতিক গুণাবলিসম্পন্ন কর্মীদের। কারণ, কোনো কর্মসূচির দফাসমূহকে নয়; বরং যেসব লোক কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য অগ্রসর হয় তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্রকেই অবশেষে সমাজ এবং সমষ্টির সাথে সংঘর্ষশীল ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। তাই কোনো কর্মসূচি ও প্রোগ্রাম স্থির করার পূর্বে কাজের জন্য কোন ধরনের কর্মীর প্রয়োজন, তাদের কোন গুণাবলি সমন্বিত হতে হবে ও কোন ত্রুটিমুক্ত হতে হবে এবং এ ধরনের কর্মী তৈরির উপায় কী, এ সম্পর্কে আমাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর আমি অভিপ্সীত গুণাবলিকে তিন অংশে আলোচনা করতে চাই–

প্রথমত, কাজের ভিত্তি হিসেবে এ কাজে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যেসব গুণ থাকা উচিত সেগুলো হচ্ছে–

১. দ্বীনের নির্ভুল জ্ঞান;
২. তার প্রতি অটুট বিশ্বাস;
৩. সে অনুযায়ী চরিত্র গঠন ও কর্ম সম্পাদন;
৪. তাকে প্রতিষ্ঠিত করাকে নিজের জীবনোদ্দেশ্যে পরিণত করা।

দ্বিতীয়ত, যে দল এ কাজ সম্পাদনে অগ্রসর হয় তার মধ্যে যেসব গুণ থাকা উচিত সেগুলো হচ্ছে–

১. পারস্পরিক ভালোবাসা, পরস্পরের প্রতি সুধারণা, আন্তরিকতা, সহানুভূতি, কল্যাণ কামনা ও পরস্পরের জন্য ত্যাগ স্বীকার।
২. সংগঠন, শৃঙ্খলা, সুসংবদ্ধতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহযোগিতা ও টিম স্পিরিট;
৩. পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা এবং পরামর্শের ইসলামী নীতি পদ্ধতির প্রতি নজর রাখা।
৪. সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনা, এ সমালোচনা হতে হবে ভদ্রতার সাথে, যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে, যার ফলে দলের মধ্যে সৃষ্ট অসৎ গুণাবলি বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে যথাসময়ে তার অপনোদন সম্ভব হবে।

তৃতীয়ত, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে নির্ভুল পথে পরিচালিত করার ও তাকে সাফল্যের মঞ্জিলে পৌছানোর জন্য যেসব গুণ অপরিহার্য সেগুলো হচ্ছে–

১. আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন ও তার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা;
২. আখিরাতের জবাবদিহিকে স্মরণ রাখা এবং আখিরাতের পুরস্কার ভিন্ন অন্য কিছুর প্রতি নজর না দেওয়া;
৩. চরিত্র মাধুর্য;
৪. ধৈর্য;
৫. প্রজ্ঞা।

এখন আমি এ মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনে সচেষ্ট ব্যক্তিবর্গকে যেসব অসৎ গুণ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত সেগুলো আলোচনা করবো।

মৌলিক ও অসৎ গুণাবলি

গর্ব ও অহংকার

সমস্ত সৎগুণের মুলোৎপাটনকারী প্রধানতম ও সবচাইতে মারাত্মক অসৎ গুণ হচ্ছে গর্ব অহংকার, আত্মাভিমান ও নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ। এটি একটি শয়তানি প্রেরণা এবং শয়তানি কাজেরই উপযোগী হতে পারে। শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহর সাথে সংযুক্ত। (তাই এ অসৎ গুণ সহকারে কোনো সৎকাজ করা যেতে পারে না) বান্দাহর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব ও অহংকার একটি নির্জলা মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি বা দল এ মিথ্যা গর্ব-অহংকারে লিপ্ত থাকে সে আল্লাহর সব রকমের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, আল্লাহ নিজের বান্দাহর মধ্যে এ বস্তুটিই সবচাইতে বেশি অপছন্দ করেন। ফলে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি কোনোক্রমেই সঠিক পথ লাভ করতে পারে না। সে সর্বদা মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে থাকে। এভাবে অবশেষে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। ফলে মানুষের সাথে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সে যতই গর্ব ও অহংকারের প্রকাশ করে ততই তার বিরুদ্ধে ঘৃণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এমনকী অবশেষে সে মানুষের চোখে ঘৃণিত হয়ে এমন পর্যায়ে উপনীত হয়। যার ফলে মানুষের ওপর তার কোনো নৈতিক প্রভাব কায়েম থাকে না।

সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যারা কাজ করে তাদের মধ্যে বিভিন্ন পথে এ রোগটি অনুপ্রবেশ করে। সংকীর্ণমনা লোকদের মনে এ রোগটি একটি বিশেষ পথে অনুপ্রবেশ করে। যখন আশেপাশের দ্বীনি ও নৈতিক অবস্থার তুলনায় তাদের অবস্থা অনেকটা ভালো হয়ে ওঠে এবং তারা কিছু উল্লেখযোগ্য জনসেবামূলক কার্যাবলী সম্পাদন করে, ফলে অন্যের মুখেও তার স্বীকৃতি শোনা যায়, তখন শয়তান তাদের অন্তরে ওয়াসওয়াসা পয়দা করতে থাকে যে, সত্যই তোমরা মহাবুজর্গ হয়ে গেছ। শয়তানের প্ররোচনায়ই তার স্বমুখে ও স্বকীয় কার্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে থাকে। এভাবে

সৎকাজের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কাজের সূচনা হয়েছিল তা ধীরে ধীরে ভুল পথে অগ্রসর হয়। এ রোগের অনুপ্রবেশের দ্বিতীয় পথটি হচ্ছে যারা সদিচ্ছা সহকারে নিজের ও মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালায় তাদের মধ্যে অবশ্য কিছু না কিছু সদগুণাবলি সৃষ্টি হয়, কোনো না কোনো পর্যায়ে তারা নিজেদের সমাজের সাধারণ অবস্থার মধ্যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় এবং তাদের কিছু না কিছু জনসেবামূলক কাজ উল্লেখ হয়। এগুলো সমাজের প্রশস্ত অঙ্গনে প্রকাশ্য দিবালোকে অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। এগুলো দৃষ্টিগোচর হওয়াই স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কিন্তু মনের লাগাম সামান্য ঢিলে হয়ে গেলেই শয়তানের সফল প্ররোচনায় তা অহংকার, আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতায় পরিণত হয়। আবার অনেক সময় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যার ফলে তাদের বিরোধীরা যখন তাদের কাজের মধ্যে বাঁধা সৃষ্টি করে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার গলদ আবিষ্কারের চেষ্টা করে তখন বাধ্য হয়েই আত্মরক্ষার তাগিদে তাদের কিছু না কিছু বলতে হয়। তাদের বলা ঘটনা ভিত্তিক ও বাস্তব সত্য হতে পারে কিন্তু তার মধ্যে নিজের গুণাবলির প্রকাশ অবশ্যই থাকে। একটু সামান্য ভারসাম্যহীনতা এ বস্তুটিকে বৈধ সীমা ডিঙিয়ে গর্বের সীমান্তে পৌঁছে দেয়। এটি একটি মারাত্মক বস্তু। প্রত্যেক ব্যক্তি ও দলকে এ সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।

বাঁচার উপায়

বন্দেগির অনুভূতি : যারা আন্তরিকতার সাথে সংস্কার ও সংশোধনের উদ্দেশ্য নিয়ে অগ্রসর হয় তাদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে অবশ্যই বন্দেগির অনুভূতি নিছক বিদ্যমান নয়; বরং জীবিত ও তাজা থাকা উচিত। তাদের কখনো এ নির্জলা সত্য বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, অহংকার ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ একমাত্র আল্লাহর সাথে বিশেষিত। আল্লাহর তুলনায় অসহায়তা ও দীনতা, অক্ষমতা ছাড়া বান্দাহর দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই। কোনো বান্দাহর মধ্যে যদি সত্যই সদগুণের সৃষ্টি হয়, তাহলে তা আল্লাহর মেহেরবানি, তা গর্বের ও অহংকারের নয়; বরং কৃতজ্ঞতার বিষয়। এজন্য আল্লাহর কাছে আরও বেশি করে দীনতা প্রকাশ করা উচিত এবং এ সামান্য মূলধনকে সৎকর্মশীলতার সেবায় নিযুক্ত করা উচিত। এর ফলে আল্লাহ আরও মেহেরবানি করবেন এবং এ মূলধন ফুলে ফেঁপে উঠবে। সদগুণ সৃষ্টি

হওয়ার পর অহংকারে মত্ত হওয়া আসলে তাকে অসদগুণে পরিবর্তিত করার নামান্তর। এটি উন্নতি নয়, অবনতির পথ।

আত্মবিচার

বন্দেগির অনুভূতির পর দ্বিতীয় যে বস্তুটি মানুষকে অহংকার প্রবণতা থেকে রক্ষা করতে পারে সেটি হচ্ছে আত্মবিচার। যে ব্যক্তি নিজের সদগুণাবলি অনুভব করার সাথে সাথে নিজের দুর্বলতা, দোষ ও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোও দেখে সে কখনো আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার শিকার হতে পারে না। নিজের গুনাহ ও দোষ ত্রুটির প্রতি যার নজর থাকে, ইস্তেগফার করতে করতে অহংকার করার চিন্তা করার মতো অবকাশ তার থাকে না।

মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি

আর একটি বস্তু এই ক্ষতিকর প্রবণতা রোধ করতে পারে। তাহলো কেবল নিজের নিচের তলার দিকে দৃষ্টিপাত করা উচিত নয়, যাদের চাইতে সে নিজেকে বুলন্দ ও উন্নত প্রত্য করে আসছে; বরং তাকে দ্বীন ও নৈতিকতার উন্নত ও মূর্ত প্রতীকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত যাদের চাইতে সে এখনও অনেক নিম্ন পর্যায়ে অবস্থান করছে। নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্নতির ন্যায় অবনতিও সীমাহীন। সবচাইতে দুষ্ট প্রকৃতির লোকও যদি নিচের দিকে তাকায় তাহলে কাউকে নিজের চাইতেও দুষ্ট ও অসৎ দেখে নিজের উন্নত অবস্থার জন্য গর্ব করতে পারে। এ গর্বের ফলে সে নিজের বর্তমান অবস্থার ওপর নিশ্চিত থাকে এবং নিজেকে উন্নত করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়। বরং এর চাইতেও আরও আগে অগ্রসর হয়ে মনে শয়তানি প্রবৃত্তি তাকে আশ্বাস দেয় যে, এখনও আরও কিছুটা নিচে নামার অবকাশ আছে। এ দৃষ্টিভঙ্গী একমাত্র তারাই অবলম্বন করতে পারে যারা নিজেদের উন্নতির দুশমন। যারা উন্নতির সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে তারা নিচে তাকানোর পরিবর্তে হামেশা ওপরের দিকে তাকায়। উন্নতির প্রতিটি পর্যায়ে উপনীত হয়ে তাদের সামনে আরও উন্নতির পর্যায় দেখা দেয়। সেগুলো প্রত্যক্ষ করে গর্বের পরিবর্তে নিজের অবনতির অনুভূতি তাদের দিলে কাঁটার মতো বিঁধে। এ কাঁটার ব্যাথা তাদের উন্নতির আরও উচ্চমার্গে আরোহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

দলগত প্রচেষ্টা

এই সঙ্গে দলকে সবসময় এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে ও নিজের সমগ্র পরিসরে সকল প্রকার গর্ব, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার প্রকাশ সম্পর্কে অবগত হয়ে যথাসময়ে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যেন এমন পদ্ধতি অবলম্বন না করা হয় যার ফলে মানুষের মধ্যে কৃত্রিম দীনতা ও নগণ্যতার প্রদর্শনী করার মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি হয়। আত্মম্ভরিতার গায়ে কৃত্রিম দীনতা-হীনতার পর্দা ছড়িয়ে রাখার মতো মারাত্মক অহংকার আর নেই।

প্রদর্শনেচ্ছা

আর একটি অসৎগুণ অহংকারের চাইতেও মারাত্মকভাবে সৎকাজকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলে। তা হলো প্রদর্শনেচ্ছা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বা দল লোক দেখানোর জন্য, মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর উদ্দেশ্যে কোনো সৎকাজ করলে তা এ পর্যায়ে উপনীত হয়। এ বস্তুটি কেবল আন্তরিকতারই নয় আসলে ঈমানেরও পরিপন্থী এবং এ জন্যই একে প্রচ্ছন্ন শিরক গণ্য করা হয়েছে। আল্লাহ ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবি হচ্ছে এই যে, মানুষ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবে, একমাত্র তাঁর নিকট থেকে পুরস্কার লাভের আশা পোষণ করবে এবং দুনিয়ার পরিবর্তে আখিরাতের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রাখবে। কিন্তু প্রদর্শনেচ্ছু ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনকে লক্ষ্যে পরিণত করে, মানুষের নিকট থেকে পুরস্কার লাভ করতে চায়। এর অর্থ দাড়ায়, সে মানুষকে আল্লাহর শরিক ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বানিয়েছে। বলাবাহুল্য, এ অবস্থায় মানুষ আল্লাহর দ্বীনের যে পরিমাণ ও পর্যায়ের খেদমত করুক না কেন, তা কোনোক্রমেই আল্লাহর জন্য ও দ্বীনের জন্য হবে না এবং আল্লাহর নিকট তা কখনোই সৎকাজরূপেও গৃহীত হবে না।

এ ক্ষতিকর প্রবণতাটি যে কেবল ফলাফলের দিক থেকেই কর্মকে নষ্ট করে তা নয়; বরং এ প্রবণতা সহকারে কোনো যথার্থ কাজ করাও সম্ভব নয়। এ প্রবণতার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, মানুষ কাজের চাইতে কাজের বিজ্ঞাপনের চিন্তা করে বেশি। দুনিয়ায় যে কাজের ঢাকঢোল পিটানো হয় এবং যেটি মানুষের প্রশংসা অর্জন করে সেটিকেই সে কাজ মনে করে। যে নীরব কাজের খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ রাখে না সেটি তার কাছে

কোনো কাজ বলে মনে হয় না। এভাবে মানুষের কাজের পরিমণ্ডল কেবল প্রচারযোগ্য কাজ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং প্রচারের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়ার পর ওই কাজগুলোর প্রতি আর কোনো প্রকার আকর্ষণ থাকে না। যতই আন্তরিকতার সাথে বাস্তব কার্যারম্ভ করা হোক না কেন এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথেই যক্ষ্মারোগে জীবনীশক্তি ক্ষয় হওয়ার ন্যায় মানুষের আন্তরিকতা অন্তর্হিত হতে থাকে। অতঃপর লোকচক্ষুর বাইরেও সৎভাবে অবস্থান করা এবং নিজের কর্তব্য মনে করে কোনো কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে প্রত্যেক বস্তুকে লোক দেখানো মর্যাদা ও মৌখিক প্রশংসার মূল হিসেবে বিচার করে। প্রতিটি কাজে সে দেখে মানুষ কোনটা পছন্দ করে। ঈমানদারির সাথে তার বিবেক কোনো কাজে সায় দিলেও যদি সে দেখে যে, এ কাজটি দুনিয়ায় তার জনপ্রিয়তা নষ্ট করে দেবে তাহলে তার পক্ষে এমন কোনো কাজ করার কথা চিন্তা করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ঘরের কোণে বসে যারা আল্লাহ আল্লাহ করে তাদের জন্য এ ফিতনা থেকে মুক্ত থাকা তুলনামূলকভাবে অনেক সহজ। কিন্তু যারা বৃহত্তর সমাজক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং সংশোধন, জনসেবা ও সমাজ গঠনমূলক কাজ করে তারা সবসময় এই বিপদের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে থাকে। যেকোনো সময় এ নৈতিক যক্ষ্মার জীবাণু তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে পারে। জনসম্মুখে প্রকাশিত হয় এমন বহু কাজ তাদের জনগণকে নিজেদের পক্ষাবলম্বী ও তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করতে হয়। যেগুলোর কারণে মানুষ তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাদের প্রশংসায় উচ্চকণ্ঠ হয়। তাদের বিরোধিতারও সম্মুখীন হতে হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও আত্মরক্ষার খাতিরে বাধ্য হয়ে নিজেদের ভালো কাজগুলোকে জনসম্মুখে তুলে ধরতে হয়। এ অবস্থায় খ্যাতির সাথে খ্যাতির মোহ না থাকা, কাজের প্রদর্শনী সত্ত্বেও প্রদর্শনেচ্ছা না থাকা, জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও সেটি লক্ষ্যে পরিণত না হওয়া, মানুষের প্রশংসাবাণী পাওয়া সত্ত্বেও তা অর্জনের চিন্তা বা আকাঙ্ক্ষা না করা চাট্টিখানি কথা নয়। এ জন্য কঠোর পরিশ্রম, প্রচেষ্টা ও সাধনা প্রয়োজন। সামান্যতম গাফিলতিও এ ব্যাপারে প্রদর্শনেচ্ছার রোগ-জীবাণুর অনুপ্রবেশের পথ করতে পারে।

এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উভয় ধরনের প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা

ব্যক্তিগত পর্যায়ে যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে তার পদ্ধতি হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অত্যন্ত সংগোপনে চুপে চুপে কিছু না কিছু সৎকাজ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং নিজের মনোজগৎ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, সে ওই গোপন সৎকাজগুলোর ও জনসমক্ষে প্রকাশিত সৎকাজগুলোর মধ্যে কোন গুলোর ব্যাপারে অধিক আকর্ষণ অনুভব করে। যদি দ্বিতীয়টির সাথে অধিক আকর্ষণ অনুভূত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান হওয়া দরকার যে, প্রদর্শনেচ্ছা তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং এজন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে দৃঢ় সংকল্প হয়ে মনের এ অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে হবে।

সামষ্টিক প্রচেষ্টা

সামষ্টিক প্রচেষ্টার পদ্ধতি হচ্ছে, দল নিজের সীমানার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছাকে কোনো প্রকারে ঠাঁই দেবে না। কাজের প্রকাশ ও প্রচারকে যথার্থ প্রয়োজন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখবে। প্রদর্শনেচ্ছার সামান্যতম প্রভাবও যেখানে অনুভূত হবে সেখানে তৎক্ষণাৎ তার পথ রোধ করবে। দলীয় পরামর্শ ও আলোচনা কখনো এমন খাতে প্রবাহিত হবে না যে, অমুক কাজ করলে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যাবে কাজেই কাজটি করা উচিত বা অমুক কাজ লোকেরা পছন্দ করে কাজেই ওই কাজটি করা প্রয়োজন। দলের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ এমন হতে হবে যার ফলে মানুষের প্রশংসা ও নিন্দাবাদের পরোয়া না করে কাজ করার মতো মানসিকতা সেখানে সৃষ্টি হয় এবং নিন্দাবাদের ফলে ভেঙে পড়ার ও প্রশংসা শুনে নবোদ্যমে অগ্রসর হওয়ার মানসিকতা লালিত না হয়। এ সত্ত্বেও যদি দলের মধ্যে প্রদর্শনী করার মনোবৃত্তি সম্পন্ন কিছু লোক পাওয়া যায় তাহলে তাদের উৎসাহিত করার পরিবর্তে তাদের রোগের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত।

ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত

তৃতীয় মৌলিক দোষ হচ্ছে, নিয়তের গলদ। এর ওপর কোনো সৎকাজের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। সৎকাজের প্রসার ও সেজন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আল্লাহর নিকট সফলকাম হওয়ার আন্তরিক ও পার্থিব স্বার্থ বিবর্জিত নিয়তের মাধ্যমেই

কেবল মাত্র দুনিয়ায় কোনো সৎকাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ নিয়তের সাথে নিজের কোনো ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ সংশিষ্ট থাকা উচিত নয়। কোনো পার্থিব স্বার্থ এর সাথে মিশ্রিত থাকতে পারবে না। এমনকী কোনো প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষে সৎকাজের এ উদ্দেশ্যের সাথে নিজের জন্য কোনো লাভের আশা জড়িত থাকতে পারবে না। এ ধরনের স্বার্থপ্রীতি কেবল আল্লাহর নিকট মানুষের প্রাপ্য নষ্ট করে দেবে না; বরং এ মনোবৃত্তি নিয়ে দুনিয়াতেও কোনো যথার্থ কাজ করা যাবে না। নিয়তের ত্রুটির প্রভাব অবশ্যই কাজের ওপর পড়ে এবং ত্রুটিপূর্ণ কাজ নিয়ে এমন কোনো প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়, যার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মন্দকে খতম করে ভালোকে প্রতিষ্ঠিত করা।

ইতঃপূর্বে যে অসুবিধার কথা বলেছি এখানেও আবার তার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন আংশিক সৎকাজ করার সময় নিয়তকে ত্রুটিমুক্ত রাখা বেশি কঠিন নয়। সামান্য পরিমাণ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও সাচ্চা প্রেরণা এজন্য যথেষ্ট হতে পারে। কিন্তু যারা সমগ্র দেশের জীবনব্যবস্থা সংশোধন করার এবং সামগ্রিকভাবে তাকে ইসলাম নির্দেশিত ভিত্তিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য কেবলমাত্র চিন্তা পরিগঠন বা প্রচার-প্রপাগান্ডা অথবা চরিত্র সংশোধনের প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করতে পারে না; বরং এই সঙ্গে তাদেরকে অবশ্যই নিজেদের উদ্দেশ্যের দিকে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মোড় পরিবর্তনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হয়। এভাবে ক্ষমতা সরাসরি তাদের হাতে আসে অথবা এমন কোনো দলের হাতে স্থানান্তরিত হয় যে তাদের সমর্থন ও পৃষ্টপোষকতা লাভ করে। এ দুটি অবস্থার যেকোনো একটিতেও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে বাদ দিয়ে ক্ষমতার কথা চিন্তা করা যেতে পারে না। ব্যাপারটি এখন সমুদ্র গর্ভে অবস্থান করে গায়ে পানি লাগাতে না দেওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। কোনো দল পরিপূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে এ কাজ করবে এবং এরপরও তার সদস্যদের ব্যক্তিগত নিয়ত ও সমগ্র দলের সামষ্টিক নিয়ত ক্ষমতার লোভ বিমুক্ত থাকবে, এজন্য কঠিন আত্মিক পরিশ্রম ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।

এ ব্যাপারে নির্ভুল দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করার জন্য দুটি আপাত সামঞ্জস্যশীল বস্তুর সূক্ষ্ম পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা উচিত। বলাবাহুল্য, অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে যারা এই পরিবর্তন চায় ক্ষমতা

স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেইসব সমগ্র জীবনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়াসী ব্যক্তির দিকে বা তাদের পছন্দসই লোকদের দিকে স্থানান্তরিত হয়। কিন্তু যারা নিজেদের জন্য ক্ষমতা চায় আর যারা নিজেদের আদর্শ ও লক্ষ্যের জন্য ক্ষমতা চায় তাদের উভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নীতি ও আদর্শের কর্তৃত্ব কার্যত নীতি ও আদর্শের বাহকদের কর্তৃত্ব হলেও নীতি ও আদর্শের কর্তৃত্ব চাওয়া এবং তার বাহকদের নিজেদের জন্য কর্তৃত্ব চাওয়া আসলে দুটি আলাদা বস্তু। এ উভয়ের মধ্যে প্রেরণা ও প্রাণ বস্তুর দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। নিয়তের ত্রুটি দ্বিতীয়টির মধ্যে আছে, প্রথমটির মধ্যে নেই। আর প্রথম বস্তুটির জন্য মরণপণ প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও দ্বিতীয় বস্তুটির সামান্যতম গন্ধও মনের মধ্যে প্রবেশ করবে না, এজন্য কঠোর আত্মিক পরিশ্রম করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কিরামের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে রয়েছে। তাঁরা সমগ্র জীবনব্যবস্থা পরিবর্তন করে ইসলামী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালান। এ জন্য রাজনৈতিক বিজয় ও কর্তৃত্বের প্রয়োজন ছিল। কারণ এ ছাড়া দ্বীনকে পুরোপুরি বিজয়ী করা সম্ভব ছিল না। আর কার্যত এ প্রচেষ্টার ফলে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা তাদের হাতে এলেও কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এ সন্দেহ পোষণ করতে পারে না যে, ক্ষমতা হস্তগত করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল। অন্যদিকে যারা নিজেদের কর্তৃত্ব চেয়েছিল তাদের দৃষ্টান্তও ইতিহাসের পাতায় রয়েছে। এ দৃষ্টান্ত তালাশ করার জন্য ইতিহাসের পাতা উল্টাবারই বা কী প্রয়োজন, আমাদের চোখের সামনেই তাদের অনেকেই ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। বাস্তবে কর্তৃত্ব লাভ করাকে যদি নিছক একটি ঘটনা হিসেবে বিচার করা হয় তাহলে উভয় দলের মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখা যাবে না। কিন্তু নিয়তের দিক দিয়ে উভয়ের কাজ, প্রচেষ্টা এবং সংগ্রামী যুগের কাজ ও সাফল্য যুগের কাজও দ্ব্যর্থহীন সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছে।

যারা সাচ্চা দিলে ইসলামী নীতি ও আদর্শ অনুযায়ী জীবনব্যবস্থায় সার্বিক কর্তৃত্ব চায় তাদের ব্যক্তিগতভাবেও এ পার্থক্যকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করে নিজেদের নিয়ত ঠিক রাখা উচিত। এবং তাদের দলেরও সামগ্রিকভাবে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো উচিত যেন নিজের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রত্যাশা কোনো অবস্থায়ও এর ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে না পারে।

মানবিক দুর্বলতা

এরপর এমন কতগুলো দোষত্রুটি আছে যেগুলো ভিত্তিমূলকে ধ্বসিয়ে না দিলেও নিজের প্রভাবের দিক দিয়ে কাজকে বিকৃত করে থাকে এবং গাফিলতির দরুণ এগুলো লালিত হতে থাকলে ধ্বংসকর প্রমাণিত হয়। এ সমস্ত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে শয়তান সৎকাজের পথ রোধ করে, মানবিক প্রচেষ্টাকে ভালোর থেকে খারাপের দিকে নিয়ে যায় এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। সমাজ দেহের সুস্থতার জন্য সর্ববস্থায় এ দোষগুলোর পথ রুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বিশেষ করে সমাজ সংশোধন ও সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনে আন্তরিক ব্যক্তি ও দলের এ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা উচিত।

এ দোষগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করলে জানা যায় যে, এগুলোর উৎসমূল মানুষের এমন কতিপয় দুর্বলতা যার প্রত্যেকটিই অসংখ্য দোষের জন্ম দেয়। বিষয়টি সহজভাবে বুঝতে হলে এক একটি দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করে তার তাৎপর্য বুঝতে হবে। অতঃপর তা কীভাবে পর্যায়ক্রমে অসৎকাজের জন্ম দেয় এবং তার বিকাশ ও পরিপুষ্টি সাধন করে কোন কোন দোষত্রুটির সৃষ্টি করে, তা অনুধাবন করতে হবে। এভাবে প্রত্যেক দোষের উৎস আমরা জানতে পারব এবং তার সংশোধনের জন্য কোথায় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তাও নির্ণয় করতে সক্ষম হব।

আত্মপূজা

মানুষের সকল দুর্বলতার মধ্যে সবচাইতে বড়ো ও মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টিকারী দুর্বলতা হচ্ছে 'স্বার্থপূজা'। এর মূলে আছে আত্মপ্রীতির স্বাভাবিক প্রেরণা। এ প্রেরণা যথার্থ পর্যায়ে দোষণীয় নয়; বরং নিজের নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অপরিহার্য এবং উপকারীও। আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে তার ভালোর জন্য এ প্রেরণা উজ্জীবিত রেখেছেন। এর ফলে সে নিজের সংরক্ষণ,

কল্যাণ ও উন্নতির জন্য প্রচেষ্টা চালাতে পারে। কিন্তু শয়তানের উসকানিতে যখন এ প্রেরণা আত্মপূজা ও আত্মকেন্দ্রীকতায় রূপান্তরিত হয় তখন তা ভালোর পরিবর্তে মন্দের উৎসে পরিণত হয়। তারপর এর অগ্রগতির প্রতিটি পর্যায়ে নতুন নতুন দোষের জন্ম হতে থাকে।

আত্মপ্রীতি

মানুষ যখন নিজেকে ত্রুটিহীন ও সমস্ত গুণাবলির আঁধার মনে করে নিজের দোষ ও দুর্বলতার অনুভূতিকে ঢাকা দেয় এবং নিজের প্রতিটি দোষত্রুটির ব্যাখ্যা করে নিজেকে সবদিক দিয়ে ভালো মনে করে নিশ্চিন্ততা লাভ করে, তখন এ আত্মপ্রীতির প্রেরণা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং সর্পিল গতিতে অগ্রসর হতে থাকে। এ আত্মপ্রীতি প্রথম পদক্ষেপই তার সংশোধন ও উন্নতির দ্বার স্বহস্তে বন্ধ করে দেয়।

অতঃপর যখন 'আমি কত ভালো' এ অনুভূতি নিয়ে মানুষ সামাজ জীবনে প্রবেশ করে তখন সে নিজেকে যা মনে করে রেখেছে অন্যরাও তাকে তাই মনে করুক এ আকাঙ্ক্ষা তার মনে জাগে। সে কেবল প্রশংসা শুনতে চায়। সমালোচনা তার নিকট পছন্দ হয় না। তার নিজের কল্যাণার্থে যেকোনো উপদেশবাণীও তার অহমকে পীড়িত করে। এভাবে এ ব্যক্তি নিজের সংশোধনের অভ্যন্তরীণ উপায়-উপকরণের সাথে সাথে বাইরের উপায়-উপকরণেরও পথ রোধ করে।

কিন্তু সমাজজীবনে সকল দিক দিয়ে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী পছন্দসই অবস্থা লাভ করা দুনিয়ার কোনো ব্যক্তির জন্য সম্ভবপর হয় না। বিশেষ করে আত্মপ্রেমিক ও আত্মপূজারী তো এখানে সর্বত্র ধাক্কা খায়। কারণ তার অহম নিজের মধ্যে এমন সব কার্যকারণ উপস্থিত করে, যা সমাজের অসংখ্য গুণাবলির সাথে তার সংঘর্ষকে অনিবার্য করে তোলে। অন্যদিকে সমাজের সামগ্রিক অবস্থাও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে সংঘর্ষশীল হয়। এ অবস্থা ওই ব্যক্তিকে কেবল নিজের সংশোধনের অভ্যন্তরীণ ও বাইরের উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত করে না; বরং এই সঙ্গে অন্যের সাথে সংঘর্ষ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরাজয়ের দুঃখ তার আহত ও বিক্ষুব্ধ অহমকে একের পর এক মারাত্মক অসৎ কাজের মধ্যে নিক্ষেপ করতে থাকে। সে জীবনে অনেক লোককে নিজের চাইতে ভালো দেখে। অনেক লোকের ব্যাপারে সে মনে

করে, সমাজ তাদেরকে তার চাইতে বেশি দাম দেয়। সে নিজে যে মর্যাদার প্রত্যাশী অনেক লোক তাকে তা দেয় না। সে নিজেকে যে সব মর্যাদার হকদার মনে করে সে পর্যন্ত পৌঁছার পথে অনেক লোক তার জন্য বাঁধার সৃষ্টি করে। অনেক লোক তার সমালোচনা করে এবং তার মর্যাদাহানী করে। এ ধরনের বিচিত্র অবস্থা তার মনে বিভিন্ন মানুষের বিরুদ্ধে হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সে অন্যের অবস্থা অনুসন্ধান করে, অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়, গিবত করে, গিবত শুনে তার স্বাদ গ্রহণ করে, চোগলখুরী করে, কানাকানী করে এবং ষড়যন্ত্র করে বেড়ায়। আর যদি তার নৈতিকতার বাঁধন ঢিলে হয়ে থাকে অথবা অনবরত ওই সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকার কারণে ঢিলে হয়ে যায়, তাহলে আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে মিথ্যা দোষারোপ, অপপ্রচার প্রভৃতি মারাত্মক ধরনের অপরাধ করে বসে। এ সমস্ত অসৎ কাজ করতে করতে সে নৈতিকতার সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে যায়। তবে যদি কোনো পর্যায়ে পৌঁছে সে নিজের এ প্রারম্ভিক ভ্রান্তি অনুভব করতে পারে, যা তাকে এ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে। তাহলে সে এ পতন থেকে বাঁচতে পারে।

কোনো এক ব্যক্তি এ অবস্থার সম্মুখীন হলে কোনো প্রকার সামাজিক বিপর্যয় দেখা দেয় না। এর প্রভাব বড়ো জোর কয়েক ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যায়। তবে যদি সমাজে বহু আত্মপূজার রোগীর অস্তিত্ব থাকে, তাহলে তাদের ক্ষতিকর প্রভাবে সমগ্র সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হয়। বলাবাহুল্য, যেখানে পরস্পরের মধ্যে কু-ধারণা, গোয়েন্দা মনোবৃত্তি, পরদোষ অনুসন্ধান, গিবত ও চোগলখুরীর দীর্ঘ সিলসিলা চলতে থাকে, সেখানে অনেক লোক মনের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে অসৎবৃত্তি লালন করে এবং হিংসা ও পরস্পরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। যেখানে অনেক আহত অহং প্রতিরোধ স্পৃহায় ভরপুর থাকে, সেখানে কোনো বস্তু গ্রুপ সৃষ্টির পথ রোধ করতে পারে না। সেখানে কোনো প্রকার গঠনমূলক সহযোগিতা দূরের কথা মধুর সম্পর্কের সম্ভবনাই থাকে না। এহেন পরিবেশে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ আত্মপূজার রোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং ধীরে ধীরে ভালো ভালো সৎলোকেরাও এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কারণ, সৎ ব্যক্তি তার মুখের ওপর যথার্থ সমালোচনাই নয় অযথার্থ সমালোচনাও বরদাশত করতে পারে কিন্তু গিবত তার মনে ক্ষোভ সৃষ্টি না করে থাকতে পারে না। এর কমপক্ষে এতোটুকু প্রভাব পড়ে যে,

গিবতকারীর ওপর আস্থা স্থাপন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এভাবে কোনো সৎ ব্যক্তি হিংসা বিদ্বেষের ভিত্তিতে তার প্রতি যে সমস্ত বাড়াবাড়ি করা হয় সেগুলো মাফ করতে পারে। সে গালিগালাজ, দোষারোপ, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ও এর চাইতে অধিক কষ্টদায়ক জুলুম উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু যেসব লোকেরা এহেন অসৎ গুণের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হয়েছে তাদের সাথে নিশ্চিত হয়ে কোনো কারবার করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে, এ অসৎ গুণাবলি যে সামাজিক পরিবেশে বিকাশ লাভ করে তা কীভাবে শয়তানের প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এমনকী এ ব্যাপারে অত্যন্ত সৎব্যক্তিত্ব সংঘর্ষ মুক্ত থাকলেও দ্বন্দ্ব মুক্ত থাকতে পারে না।

অতঃপর যারা সমাজ সংশোধন ও পরিগঠনের জন্য সমষ্টিগতভাবে প্রচেষ্টা চালাতে চায় তাদের দলের যে এহেন অসৎ ব্যক্তিদের থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হওয়া অপরিহার্য এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। আসলে আত্মপূজা এ ধরনের দলের জন্য কলেরা ও বসন্তের জীবাণুর চাইতেও অনেক বেশি ক্ষতিকর। এর উপস্থিতিতে কোনো প্রকার সৎকাজ ও সংশোধনের চিন্তাই করা যায় না।

বাঁচার উপায়

তওবা ও ইস্তেগফার : ইসলামী শরিয়াহ এ রোগটি শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এর চিকিৎসা শুরু করে দেয়। অতঃপর প্রতিটি পর্যায়ে এর পথ রোধ করার জন্য নির্দেশ দান করতে থাকে। কুরআন ও হাদিসের স্থানে স্থানে ঈমানদারদের তওবা ও ইস্তেগফার করার জন্য উপদেশ দান করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, মু'মিন যেন কোনো সময় আত্মপূজা ও আত্মপ্রীতির রোগে আক্রান্ত না হয়, কখনো আত্মম্ভরিতায় লিপ্ত না হয়, নিজের দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটি অনুভব এবং ভুল-ভ্রান্তি স্বীকার করতে থাকে ও কোনো বিরাট কাজ করার পরও অহংকারে বুক ফুলাবার পরিবর্তে দীনতার সাথে নিজের আল্লাহর সম্মুখে এই মর্মে আর্জি পেশ করে যে, তার খেদমতের মধ্যে যে গলদ রয়ে গেছে সেগুলো যেন মাফ করে দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহর (সা.) চাইতে বড়ো পূর্ণতার অধিকারী আর কে হতে পারে? কোনো ব্যক্তি দুনিয়ায় তার চাইতে বড়ো কাজ সম্পাদন করেছে? কিন্তু ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ও সর্বাপেক্ষা মহৎ

কাজ সম্পাদন করার পর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যে নির্দেশ দেওয়া হলো তা হচ্ছে–

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴿﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجًا ﴿﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿﴾

'যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে যায় আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ করতে দেখছ, তখন নিজের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করো এবং তাঁর নিকট মাগফিরাত চাও। অবশ্যই তিনি তওবা কবুলকারী।'
সূরা আন নাসর

অর্থাৎ যে মহান কাজ তুমি সম্পাদন করেছ সে সম্পর্কে জেনে রেখ, তার জন্য তোমার নয় তোমার প্রতিপালকের প্রশংসা প্রাপ্য। কারণ তাঁরই অনুগ্রহে তুমি এ মহান কাজ সম্পাদনে সফলকাম হয়েছ এবং নিজের সম্পর্কে তোমার এ অনুভূতি থাকা উচিত যে, যে কাজ তুমি সম্পাদন করেছ তা যথাযথ ও পূর্ণতার সাথে সম্পাদিত হয়নি। তাই পুরস্কার চাওয়ার পরিবর্তে কাজের মধ্যে যা কিছু অপূর্ণতা ও গলদ রয়ে গেছে তা মাফ করার জন্য নিজের প্রতিপালকের নিকট দুআ করো। হজরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত এক হাদিসে বলা হয়েছে–

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكْثِرُ أَنْ يَقُوْلَ قَبْلَ مَوْتِهِ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ

'রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে প্রায় বলতেন, আমি আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, আমি আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাচ্ছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি।'
মুসলিম : ৯৬৯

এমনিতেও রাসূলুল্লাহ (সা.) অধিকাংশ সময় তওবা ও ইস্তেগফার করতেন। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন–

وَاللهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

'আল্লাহর কসম আমি প্রতিদিন সত্তরবারেরও বেশি আল্লাহর নিকট ইস্তেগফার ও তওবা করি।' বুখারি : ৫৮৬৮

এ শিক্ষার প্রাণবস্তুকে আত্মস্থ করার পর কোনো ব্যক্তির মনে আত্মপূজার বীজ অঙ্কুরিত হতে পারবে না এবং তা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে বিপর্যয় সৃষ্টিতেও সক্ষম হবে না।

সত্যের প্রকাশ

এরপরও যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে এ ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে ইসলামী শরিয়াহ চরিত্র ও কর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতি পদে পদে এর বিকাশ ও প্রকাশের পথ রোধ করে এবং এ ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেয়। যেমন এর প্রথম প্রকাশ এভাবে হয়ে থাকে যে, মানুষ নিজেকে সমালোচনার ঊর্দ্ধে মনে করে এবং নিজের কথা ও মতামতের স্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে। অন্য কোনো ব্যক্তি তার ভুলের সমালোচনা করবে, এটা সে বরদাশত করে না। বিপরীত পক্ষে ইসলামী শরিয়াহ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকাকে সকল ঈমানদারদের জন্য অপরিহার্য করে দিয়েছে। বিশেষ করে ক্ষমতাশীন জালিমদের সম্মুখে সত্যের প্রকাশকে সর্বত্তোম জিহাদ হিসেবে গণ্য করেছে। এভাবে মুসলিম সমাজে অসৎকাজ বিরত রাখার ও সৎকাজের নির্দেশ দেওয়ার উপযোগী এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যেখানে আত্মপূজা স্থান লাভ করতে পারে না।

হিংসা ও বিদ্বেষ

আত্মপূজার দ্বিতীয় প্রকাশ হয় হিংসা ও বিদ্বেষের রূপে। আত্মপূজার আত্মপ্রীতিতে যে ব্যক্তি আঘাত হানে তার বিরুদ্ধেই মানুষ এ হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণ করতে থাকে। অতঃপর তার সাথে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে। ইসলামী শরিয়াহ একে গুনাহ গণ্য করে এ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ঘোষণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সাবধান! হিংসা করো না। কারণ হিংসা মানুষের সৎকাজগুলো এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেমন আগুন শুকনো কাঠকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেয়।'

হাদিসে বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কঠোর নির্দেশ উদ্ধৃত হয়েছে, 'তোমরা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পরকে হিংসা করো না, পরস্পরের সাথে কথা বলা বন্ধ করো না, কোনো মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন অবস্থায় থাকা বৈধ নয়।'

কু-ধারণা

আত্মপূজার তৃতীয় প্রকাশ হয় কু-ধারণার মাধ্যমে। কু-ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পর মানুষ গোয়েন্দা মনোবৃত্তি নিয়ে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে থাকে। কু-ধারণার তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ নিজের ছাড়া অন্য সবার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা রাখে যে, তারা সবাই খারাপ এবং বাহ্যতঃ তাদের যে সমস্ত বিষয় আপত্তিকর দেখা যায় সেগুলোর কোনো ভালো ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে সর্বদাখারাপ ব্যাখ্যা করে থাকে। এ ব্যাপারে সে কোনো প্রকার অনুসন্ধানেরও প্রয়োজন বোধ করে না। গোয়েন্দাগিরি এ কু-ধারণারই একটি ফসল। মানুষ অন্যের সম্পর্কে প্রথমে একটি খারাপ ধারণা করে। অতঃপর তার পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের জন্য ওই ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে খবর নিতে থাকে। কুরআন এ দুটি বস্তুকেই গুনাহ গণ্য করেছে। সূরা হুজরাতে আল্লাহ বলেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

'হে ইমানদারগণ! অনেক বেশি ধারণা করা থেকে দূরে থাকো, কারণ কোনো কোনো ধারণা গুনাহের পর্যায়ভূক্ত, আর গোয়েন্দাগিরি করো না।' সূরা হুজরাত : ১২

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সাবধান! কু-ধারণা করো না, কারণ কু-ধারণা মারাত্মক মিথ্যা।' হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, 'আমাদের গোয়েন্দাগিরি করতে ও অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে কোনো কথা প্রকাশ হয়ে গেলে আমরা পাকড়াও করব।' হজরত মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা মুসলমানদের গোপন অবস্থার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাতে থাকলে তাদের বিগড়িয়ে দেবে।'

গিবত

এ সকল পর্যায়ের পর শুরু হয় গিবতের পর্যায়। কু-ধারণা বা যথার্থ সত্য যার ওপরই এর ভিত প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, সর্বাবস্থায় কোনো ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং লাঞ্ছনা দেখে মনে আনন্দ অনুভব করা বা তা থেকে নিজে লাভবান হওয়ার জন্য তার অনুপস্থিতে তার দূর্ণাম করার নাম গিবত। হাদিসে এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 'তোমার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার কথা এমনভাবে বলা, যা সে জানতে পারলে অপছন্দ করত। রাসূলুল্লাহকে (সা.) জিজ্ঞেস করা হলো, 'যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে ওই দোষ থেকে থাকে তাহলেও কি তা গিবতের পর্যায়ভুক্ত হবে? জবাব দিলেন, যদি তার মধ্যে ওই দোষ থেকে থাকে এবং তুমি তা বর্ণনা করে থাক, তাহলে তুমি গিবত করলে। আর যদি তার মধ্যে ওই দোষ না থেকে থাকে তাহলে তুমি গিবত থেকে আরও একধাপ অগ্রসর হয়ে তার ওপর মিথ্যা দোষারোপ করলে।' কুরআন একে হারাম গণ্য করেছে। সূরা হুজরাতে বলা হয়েছে–

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ

'আর তোমাদের কেউ কারোর গিবত করবে না। তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে।' সূরা হুজরাত : ১২

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু অন্য মুসলমানের জন্য হারাম।' এ ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে, যখন কারোর দুর্নাম করার নিয়ত শামিল না থাকে। যেমন কোনো মজলুম যদি নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। কুরআনে এর অনুমতি দেওয়া হয়েছে–

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ

'আল্লাহ অসৎ কাজ সম্পর্কে কথা বলা পছন্দ করেন না, তবে যদি কারোর ওপর জুলুম হয়ে থাকে।' সূরা নিসা : ১৪৮

অথবা দৃষ্টান্তস্বরূপ মনে করুন, যখন কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় বা তার সাথে কোনো কারবার করতে চায় এবং এক পক্ষ কোনো পরিচিতজনের নিকট পরামর্শ চাইলে ওই ব্যক্তির মধ্যে সত্যিকার কোনো দোষ যদি তার জানা থাকে তাহলে কল্যাণ কামনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তা বর্ণনা করা কেবল বৈধই নয়; বরং অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজেও এসব ক্ষেত্রে দোষত্রুটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে, 'দুই ব্যক্তি ফাতেমা বিনতে কায়েসের নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠালে তিনি সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহর (সা.) সাথে পরামর্শ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে এই মর্মে হুশিয়ার করে দেন যে, তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে অভাবী এবং দ্বিতীয়জন স্ত্রীকে প্রহার করতে অভ্যস্ত।' অনুরূপভাবে শরিয়াহতে অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বর্ণনা থেকে সংরক্ষিত রাখার জন্য তাদের দোষসমূহ বর্ণনা করাকে আলেমগণ সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ বর্ণনা করেছেন এবং হাদিস শাস্ত্রের ইমামগণ কার্যত এ দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন। কারণ দ্বীনের জন্য এর প্রয়োজন ছিল। যারা মানুষের ওপর প্রকাশ্যে জুলুম করে, অনৈতিক ও ফাসেকি কাজ কর্মের প্রসার ঘটায় এবং প্রকাশ্যে অসৎ কাজ করে বেড়ায় তাদের গিবত করাও বৈধ। রাসূলুল্লাহর (সা.) নিজের কাছ থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। এইভাবে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বাবস্থাই গিবত করা হারাম এবং তা শুনাও গুনাহ শ্রোতার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, গিবতকারীকে বাঁধা দেওয়া, অন্যথায় যার গিবত করা হচ্ছে তাকে বাঁচানো, আর নয় তো সর্বশেষ পর্যায়ে যে মাহফিলে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া হচ্ছে সেখান থেকে উঠে যাওয়া।

চোগলখুরী

গিবত যে আগুন জ্বালায় চোগলখুরী তাকে বিস্তৃত করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়। স্বার্থবাদীতার প্রেরণাই হয় এর মধ্যে আসল কার্যকর শক্তি। চোগলখোর ব্যক্তি কারুর কল্যাণকামী হতে পারে না। নিন্দিত দুজনের কারুর কল্যাণ তার অভিপ্সীত হয় না। সে দুজনেরই বন্ধু সাজে কিন্তু অমঙ্গল চায়। তাই সে মনোযোগ দিয়ে দুজনের কথা শুনে, কারোর প্রতিবাদ করে না। তারপর বন্ধুর নিকট এ খবর পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে যে আগুন এক জায়গায় লেগেছিল তাকে অন্য জায়গায় লাগাতেও সাহায্য করে। ইসলামী শরিয়াহ এ কাজকে হারাম গণ্য করেছে। কারণ এর বিপর্যয়কারী ক্ষমতা গিবতের চাইতেও বেশি।

কুরআনে চোগলখুরীকে মানুষের জঘণ্যতম দোষরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

'কোনো চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' মুসলিম : ১৯২

তিনি আরও বলেছেন, 'তোমাদের সেই ব্যক্তি হচ্ছে সবচাইতে খারাপ যার দুটি মুখ। সে এক দলের নিকট একটি মুখ নিয়ে আসে আর অন্য দলের নিকট আসে অন্য মুখটি নিয়ে।' এ ব্যাপারে যথার্থ ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে এই, কোথাও কারও গিবত শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করতে হবে অথবা উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে বিষয়টির অবতারণা করে এমনভাবে এর নিষ্পত্তি করতে হবে যাতে করে একপক্ষ এমন কোনো ধারণা করার সুযোগ না পায় যে, তার অনুপস্থিতিতে অন্যপক্ষ তার নিন্দা করেছিল। আর যদি ওই ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান কোনো দোষের জন্য গিবত করা হয়ে থাকে তাহলে একদিকে গিবতকারীকে তার গুনাহ সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে এবং অন্যদিকে তার দোষ সংশোধনের পরামর্শ দিতে হবে।

কানাকানি ও ফিসফিসানী

এ ব্যাপারে সবচাইতে মারাত্মক হচ্ছে ফিসফিস করে কানে কানে কথা ও গোপনে সলা-পরামর্শ করা। যার ফলে ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও দলাদলি পর্যন্ত পৌঁছে এবং পরস্পরবিরোধী সংঘর্ষশীল গ্রুপ অস্তিত্ব লাভ করে। শরিয়াহ এর বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। কুরআনে একে শয়তানি কাজরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে–

إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ 'কানাকানি করা হচ্ছে শয়তানের কাজ।' সূরা মুজাদালাহ : ১০

এ ব্যাপারে নীতিগত পথনির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে–

إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

'যখন তোমরা নিজেদের মধ্যে কানাকানি করো তখন গুনাহ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে এবং রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য কানাকানি করো না; বরং নেকি ও তাকওয়ার ব্যাপারে কানাকানি করো।' সূরা মুজাদালাহ : ৯

অর্থাৎ দুই বা কতিপয় ব্যক্তি যদি সদুদ্দেশ্য এবং তাকওয়ার সীমানার মধ্যে অবস্থান করে কানে কানে আলাপ করে তাহলে তা কানাকানির আওতাভুক্ত হয় না। তবে দলের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে অসৎ কাজের পরিকল্পনা তৈরির উদ্দেশ্যে বা অন্য কোনো দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অথবা রাসূলুল্লাহর (সা.) নির্দেশ ও বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করার সংকল্প নিয়ে গোপনে আলাপ-আলোচনা করা অবশ্য এর আওতাভুক্ত। ঈমানদারী ও আন্তরিকতা সহকারে যে মতবিরোধ করা হয় তা কোনোদিন কানাকানিকে উদ্বুদ্ধ করে না। এ প্রাসঙ্গিক যাবতীয় আলোচনা প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং দলের সামনে হওয়া উচিত। যুক্তি সহকারে প্রতিপক্ষের স্বীকৃতি আদায়ের জন্য হওয়া উচিত। আলোচনার পর মতবিরোধ থেকে গেলেও তা কখনো বিপর্যয়ের কারণ হয় না। দল থেকে সরে গিয়ে একমাত্র সে সকল মতবিরোধের ক্ষেত্রে গোপন কানাকানির প্রয়োজন দেখা দেয় যেগুলো স্বার্থপরতাপূর্ণ না হলেও কমপক্ষে স্বার্থপরতার মিশ্রণযুক্ত। এ ধরনের কানাকানির ফল কখনো শুভ হয় না। এগুলো শুরুতে যতই নিষ্কলংক হোক না কেন ধীরে ধীরে সমগ্র দল এর ফলে কু-ধারণা, দলাদলি ও হানাহানির শিকারে পরিণত হয়। আপস গোপন আলোচনা চালিয়ে যখন কতিপয় ব্যক্তি একটি গ্রুপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন তাদের দেখাদেখি এভাবে গোপন সলাপরামর্শ করে গ্রুপ বানানোর প্রবণতা দেখা দেয়। এর ফলে এমন বিকৃতির সূচনা হয়, যা সর্বোত্তম সৎ ব্যক্তির দলকেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে দলাদলিতে লিপ্ত করে। কারও সর্বশেষ পর্যায়ে এ বিকৃতির কার্যত আত্মপ্রকাশ ঘটে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপারে মুসলমানদের বারবার সতর্ক করেছেন, ভীতি প্রদান করেছেন এবং এ থেকে বাঁচার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন–

'আরবে যারা নামাজ শুরু করেছে তারা পুনর্বার শয়তানের ইবাদত শুরু করবে, এ ব্যাপারে শয়তান নিরাশ হয়ে পড়েছে। তাই এখন তাদের মধ্যে

বিকৃতি সৃষ্টি করার ও তাদের পরস্পরকে সংঘর্ষশীল করার সাথে তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িত।'

এমনকী তিনি এ কথাও বলেছেন, 'আমার পর তোমরা কাফের হয়ে যেয়ো না এবং পরস্পরকে হত্যা করার কাজে লিপ্ত হয়ো না।' এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে ঈমানদারদের যে পদ্ধতি অবলম্বন করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে–

প্রথমত, তারা নিজেরা ফিতনায় অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন–

'তারা সৌভাগ্যবান যারা ফিতনা থেকে দূরে থাকে এবং যে ব্যক্তি যত বেশি দূরে থাকে সে তত বেশি ভালো।' এ অবস্থায় নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তির চাইতে ভালো এবং জাগ্রত ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চাইতে ভালো। আর দণ্ডায়মান ব্যক্তি চলন্ত ব্যক্তির চাইতে ভালো। অন্যদিকে যদি তারা ফিতনায় অংশগ্রহণ করে তাহলে একটি দল হিসেবে নয়; বরং অন্তরের সংশোধন প্রয়াসী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ সম্পর্কে সূরা হুজরাতের প্রথম রুকুতে দ্ব্যর্থহীন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বার্থবাদীতার এ তাৎপর্য এবং তার প্রকাশ ও বিকাশের এ সকল পর্যায় সম্পর্কিত শরিয়াহর এ বিধানসমূহ হৃদয়ঙ্গম করা তাদের জন্য একান্ত জরুরি যারা সৎবৃত্তি ও সততার বিকাশ সাধনের জন্য একত্রিত হয়। তাদের নিজেদের আত্মপ্রীতি ও আত্মম্ভরিতার রোগ থেকে বাঁচানোর জন্য পূর্ণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি দেখা দেয় সেগুলো উপলব্ধি করতে হবে। তাদের দলকেও দলগতভাবে সজাগ থাকতে হবে যেন তার মধ্যে স্বার্থবাদীতার জীবাণু অনুপ্রবেশ করে বংশ বিস্তার করার সুযোগ না পায়। নিজেদের পরিসীমার মধ্যে তাদের এমন কোনো ব্যক্তিকে উৎসাহিত না করা উচিত যে নিজের সমালোচনা শুনে ক্ষিপ্ত হয় এবং নিজের ভুল স্বীকার না করে দাম্ভিকতা দেখায়। যার কথা থেকে হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার গন্ধ আসে অথবা যার কর্মপদ্ধতি প্রকাশ করে যে, সে কারও সাথে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ পোষণ করে, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে দাবিয়ে দিতে হবে। যারা অন্যের ব্যাপারে কু-ধারণা পোষণ করে অথবা অন্যের

অবস্থা সম্পর্কে গোয়েন্দাগিরি করে তার দোষ তালাশ করার চেষ্টা করে তাদের ব্যাপারেও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। তাদের নিজেদের সমাজের মধ্যে গিবত ও চোগলখুরীর পথ রুদ্ধ করা উচিত এবং ফিতনা যেখানেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে উপরে বর্ণিত মতে সরল-সোজা ইসলামী নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। তাদের বিশেষ করে কানাকানির বিপদ থেকে সতর্ক থাকা উচিত। কারণ এর ফলে দলের মধ্যে বিভেদের সূচনা হয়। কোনো ব্যক্তি কোনো বিরোধমূলক বিষয়ে গোপন কানাকানি করে কোনো আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিজের সমর্থক বানাবার চেষ্টা করবে, এতে তার কখনো সম্মত হওয়া উচিত নয়। কিছু লোক দলের মধ্যে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করছে এমন কোনো আভাস যখনই পাওয়া যাবে তখনই দলকে তাদের সংশোধন বা মুলোচ্ছেদে সচেষ্ট হতে হবে। এ সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি দলের মধ্যে কোনো প্রকার গ্রুপিং এর ফিতনা দেখা দিয়েই থাকে তাহলে আন্তরিকতাসম্পন্ন লোকেরাও এক কোণে বসে গোপন কানাকানি শুরু করে দেবে এবং একটা গ্রুপ বানাবার জন্য ষড়যন্ত্র চালাবে। দলের মধ্যে এ ধরনের কাজের অনুমতি কোনো ক্রমেই দেওয়া যেতে পারে না; বরং তাদের নিজেদের এ ফিতনা থেকে দূরে থেকে এর গতি রোধের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং তাতে ব্যর্থ হলে দলের সম্মুখে প্রকাশ্যে বিষয়টি উপস্থাপিত করা উচিত। যে দলে আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সংখ্যাধিক্য হবে সে দল এ ধরনের ফিতনা সম্পর্কে অবগত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এর প্রতিরোধ করবে আর যে দলে ফিতনা বা নিশ্চিত নিরুদ্বেগ লোকদের সংখ্যাধিক্য হবে সে দল ফিতনায় শিকার হয়ে পর্যুদস্ত হবে।

মেজাজের ভারসাম্যহীনতা

দ্বিতীয় পর্যায়ের অনিষ্টকারিতাগুলোকে এক কথায় মেজাজের ভারসাম্যহীনতা বলা যায়। আপাতদৃষ্টিতে স্বার্থবাদীতার মোকাবিলায় এটিকে একটি সামান্য দুর্বলতা বলে মনে হয়। কারণ, এর মধ্যে কোনো প্রকার অসৎ সংকল্প, অসাধু প্রেরণা ও অপবিত্র ইচ্ছার রেশ দেখা যায় না। কিন্তু অনিষ্টকারিতা সৃষ্টির যোগ্যতার দিক দিয়ে বিচার করলে স্বার্থবাদীতার পরই এর স্থান দেখা যায় এবং অনেক সময় এর প্রভাব ও ফলাফলের অনিষ্টকারী ক্ষমতা স্বার্থবাদীতার সমপর্যায়ে এসে পৌঁছে।

চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্ম ও প্রচেষ্টার ভারসাম্যহীনতা এই মেজাজের ভারসাম্যহীনতার ফলশ্রুতি। জীবনের বহু সত্যের সাথে হয় এর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। মানুষের জীবন অসংখ্য বিপরীতধর্মী উপাদানের আপস ও বহু বিচিত্র কার্যকারণের সামষ্টিক কর্মের সমন্বয়ে গঠিত। যে দুনিয়ায় মানুষ বাস করে তার অবস্থাও সমপর্যায়ভুক্ত। মানুষকে এভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের একত্রিত হওয়ার পর যে সমস্ত কাঠামোর উদ্ভব হয় তার অবস্থাও এমনটিই হয়ে থাকে। এ দুনিয়ায় কাজ করার জন্য চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গির এমন ভারসাম্য এবং কর্ম ও প্রচেষ্টার এমন সমতা প্রয়োজন, যা বিশ্ব প্রকৃতির সমতা ও ভারসাম্যের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল। অবস্থার প্রতিটি গতিধারার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে, কাজের প্রত্যেকটি দিক অবলোকন করতে হবে, জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় প্রত্যেক বিভাগকে তার অধিকার দিতে হবে, প্রকৃতির প্রত্যেকটি দাবির প্রতি নজর রাখতে হবে এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ মনের ভারসাম্য অর্জিত না হলেও বলাবাহুল্য, এখানে সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় ভারসাম্য অপরিহার্য। তা যতটা নির্ধারিত মানের নিকটবর্তী হবে ততটা লাভজনক হবে এবং তা থেকে যতটা দূরবর্তী হবে ঠিক ততটাই জীবন সত্যের সাথে সংঘর্ষশীল হয়ে অনিষ্টের কারণ হয়ে পড়বে। দুনিয়ায় আজ পর্যন্ত বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তার সবগুলো কারণ হচ্ছে এই যে, ভারসাম্যহীন চিন্তার অধিকারীরা মানুষের সমস্যাবলী দেখা ও উপলব্ধি করার ব্যাপারে একচোখা নীতি অবলম্বন করছে। ওগুলো সমাধানের জন্য ভারসাম্যহীন পরিকল্পনা গ্রহণ করছে এবং তা কার্যকর করার জন্য অসম পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এই হচ্ছে বিকৃতির আসল কারণ। কাজেই চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য এবং কর্মপদ্ধতির সমতা গড়ার মাধ্যমেই গড়ার কাজ সম্ভবপর।

ইসলাম আমাদের সমাজ গঠন ও সংশোধনের যে পরিকল্পনা দিয়েছে তা কার্যকর করার জন্য এ গুণটির বিশেষ প্রয়োজন। কারণ এ পরিকল্পনাটি আগাগোড়া ভারসাম্য ও সমতারই একটি বাস্তব নমুনা। একে পুঁথির পাতা থেকে বাস্তব জগতে স্থানান্তর করার জন্য বিশেষ করে সেই সব কর্মী উপযোগী হতে পারে যাদের দৃষ্টি ইসলামের গঠন পরিকল্পনার ন্যায় ভারসাম্যপূর্ণ এবং যাদের স্বভাব প্রকৃতি ইসলামের সংশোধন প্রকৃতির ন্যায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রান্তিকতার রোগে আক্রান্ত লোকেরা এ কাজকে বিকৃত করতে পারে, যথাযথ রূপে সম্পাদন করতে পারে না।

ভারসাম্যহীনতা সাধারণত ব্যর্থতারূপে আত্মপ্রকাশ করে। সংশোধন ও পরিবর্তনের যেকোনো পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য কেবল নিজে তার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যথেষ্ট নয়; বরং এই সঙ্গে সমাজের সাধারণ মানুষকে সত্যতা এর যথার্থতা, উপকারিতা ও কার্যকর হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত করতে হবে এবং নিজের আন্দোলনকে এমন পর্যায়ে আনতে হবে ও এমন পদ্ধতিতে চালাতে হবে, যার ফলে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা আগ্রহ তার সাথে সংযুক্ত হয়ে যেতে থাকবে। যে আন্দোলন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতিতে ভারসাম্যের অধিকারী একমাত্র সে আন্দোলনই এ সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে। একটি চরমপন্থী পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য যদি চরমপন্থা অবলম্বন করা হয়, তা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট ও আশান্বিত করার পরিবর্তে সংশায়িত করে। তার এ দুর্বলতা তার প্রচার ও ক্ষমতা ও অনুপ্রবেশ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। তার পরিচালনার জন্য কিছু চরমপন্থী লোক একত্রিত হয়ে গেলেও সমগ্র সমাজকে তাদের নিজেদের মতো চরমপন্থী বানিয়ে নেওয়া এবং সারা দুনিয়ার চোখে ধুলো দেওয়া সহজ নয়। যে দল সমাজ গঠন ও সংশোধনের কোনো পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয় এ বস্তুটি তার জন্য বিষবৎ।

একগুঁয়েমী

মেজাজের ভারসাম্যহীনতার প্রধানতম প্রকাশ হচ্ছে মানুষের একগুঁয়েমী। এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ সাধারণত প্রত্যেক বস্তুর একদিক দেখে, অপরদিক দেখে না। প্রত্যেক বিষয়ের এক দিককে গুরুত্ব দেয়, অন্যদিককে গুরুত্ব দেয় না। যেদিকে তার মন একবার পাড়ি জমায়, সেই এক দিকেই অগ্রসর হতে থাকে, অন্য দিকে নজর দিতে প্রস্তুত হয় না। বিভিন্ন বিষয় উপলব্ধি করার ব্যাপারে সে ক্রমাগত ভারসাম্যহীনতার শিকার হতে থাকে। মত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সে একদিকে ঝুঁকতে থাকে। যাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে তাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে। একই পর্যায়ের এমনকী তার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও তার নিকট গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। যে বস্তুকে খারাপ মনে করে তার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। কিন্তু একই পর্যায়ে অন্যান্য খারাপ বস্তু; বরং তার চাইতেও বেশি খারাপ বস্তুর বিরুদ্ধে ভুলেও কোনো কথা বলে না। নীতিবাদিতা অবলম্বন করার পর সে এ ব্যাপারে স্থবিরত্বের প্রত্যন্ত সীমায় পৌঁছে যায়, কাজেই বাস্তব চাহিদাগুলোর কোনো পরোয়াই

করে না। অন্যদিকে কার্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর নীতিহীন হয়ে পড়ে এবং সাফল্যকে আসল উদ্দেশ্য বানিয়ে ন্যায়-অন্যায় সব রকম উপায় অবলম্বন করতে উদ্যত হয়।

একদেশদর্শীতা

এ অবস্থা এখানে পৌঁছে থেমে না গেলে তা সামনে অগ্রসর হয়ে চরম একদেশদর্শীতার রূপ অবলম্বন করে। অতঃপর মানুষ নিজের মতের ওপর প্রয়োজনের অধিক জোর দিতে থাকে। মতবিরোধের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে। অন্যের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখে না এবং বুঝতে চেষ্টা করে না; বরং প্রত্যেকটি বিরোধী মতের নিকৃষ্টতম অর্থ করে তা হেয় প্রতিপন্ন করতে ও দূরে নিক্ষেপ করতে চায়। এর ফলে দিনের পর দিন সে অন্যের জন্য এবং অন্যেরা তার জন্য অসহনীয় হয়ে যেতে থাকে।

একদেশদর্শীতা এখানে থেমে গেলেও ভালো ছিল। কিন্তু তাকে একটি গুণ মনে করে লালন করতে থাকলে মানুষ ক্রুদ্ধভাব, বদরাগী ও কর্কশ হয়ে পড়ে এবং অন্যের নিয়ত সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও তার উপর হামলা করতে উদ্যত হয়। যে কোনো সমাজ জীবনে এ বস্তুটি খাপ খেতে পারে না।

সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা

এক ব্যক্তি এ নীতি অবলম্বন করলে বড়োজোর সে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং যে উদ্দেশ্যে সে দলের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল তা সম্পাদন করা থেকে বঞ্চিত হবে, এর ফলে কোনো সামষ্টিক ক্ষতি হবে না। কিন্তু কোনো সমাজ সংস্থায় অনেকগুলো ভারসাম্যহীন মন ও মেজাজ একত্রিত হয়ে গেলে প্রত্যেক ধরনের ভারসাম্যহীনতা এক একটি গ্রুপের জন্ম দেয়। এক চরমপন্থার জবাবে আর এক চরমপন্থা জন্ম নেয়। মতবিরোধ কঠোর থেকে কঠোরতর হতে থাকে। সংস্থায় ভাঙন ধরে। বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। যে কাজ সম্পাদনের জন্য সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু লোক একত্রিত হয়েছিল। এই দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের আবর্তে পড়ে তা বিনষ্ট হয়ে যায়।

সত্যি বলতে কী, যে কাজ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় করা যায় না; বরং যার ধরনই হয় সামষ্টিক তা সম্পাদন করার জন্য অনেক লোককে এক সাথে কাজ করার

প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকের নিজের কথা বুঝাতে ও অন্যের কথা বুঝতে হয়। মেজাজের পার্থক্য, যোগ্যতার পার্থক্য, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য সত্ত্বেও তাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি করতে হয়, যার অবর্তমানে কোনো প্রকার সহযোগিতা সম্ভবপর হয় না। এ সামঞ্জস্যের জন্য দীনতা অপরিহার্য। আর এ দীনতা কেবলমাত্র ভারসাম্যপূর্ণ মেজাজের অধিকারী লোকদের মধ্যে থাকতে পারে, যাদের চিন্তা ও মেজাজ উভয়ের মধ্যে সমতা রয়েছে। ভারসাম্যহীন লোকেরা একত্রিত হয়ে গেলেও তাদের ঐক্য বেশিক্ষণ টিকে না। তাদের দল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং এক এক ধরনের ভারসাম্যহীনতার রোগী আলাদা আলাদা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে যায়। অতঃপর তাদের মধ্যে আবার ভাঙন দেখা দেয়। এমনকী শেষ পর্যন্ত মুক্তাদি ছাড়া কেবল ইমামদেরই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

যারা ইসলামের জন্য কাজ করেন এবং ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জীবন ব্যবস্থার সংশোধন ও পূর্ণগঠনের প্রেরণা ও ইচ্ছা পোষণ করেন, তাদের একত্রিত করে আত্মপর্যালোচনার মাধ্যমে এই ভারসাম্যহীনতার উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যা থেকে নিজেদের বাঁচাতে হবে এবং তাদের দলের সীমানার মধ্যে যাতে করে এ রোগ মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে এজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে চরমপন্থা অবলম্বনের ঘোর বিরোধী কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশাবলী তাদের সামনে থাকা উচিত। কুরআন দ্বীনের ব্যাপারে অধিক বাড়াবাড়ি করাকে আহলে কিতাবদের মৌলিক ভ্রান্তি গণ্য করেছে (ইয়া আহলাল কিতাবি লা তাগলু ফি দ্বীনিকুম) এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) নিজের অনুসারীদের এ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় তাকিদ করেছেন–

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ

সাবধান! তোমরা ধর্মের (দ্বীনের) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধর্মের (দ্বীনের) ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে ধ্বংস হয়েছে। ইবনে মাজাহ : ৩০২৯

হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক বক্তৃতায় তিনবার বলেন, হালাকাল মুতানাত্তিয়ুন– অর্থাৎ, কঠোরতা অবলম্বনকারীরা

ও বাড়াবাড়ির পথ আশ্রয়কারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর দাওয়াতের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'বুয়িসতু বিল হানিফিয়্যাতিস সামাহাহ' অর্থাৎ তিনি পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রান্তিকতার মধ্যে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা এনেছেন যার মধ্যে ব্যাপকতা ও জীবন ধারার প্রত্যেকটি দিকের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। এ দাওয়াত দানকারীদের যে পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে এর প্রথম আহ্বায়ক তা নিম্নোক্তভাবে শিখিয়েছেন–

يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا

'সহজ করো, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, ঘৃণা সৃষ্টি করো না।' বুখারি : ৬৯

إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ

'তোমাকে সহজ করার জন্য পাঠনো হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়।' তিরমিজি : ১৪৭

مَا خُيِّرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

'কখনো এমন হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে এবং তিনি তার মধ্য থেকে সবচাইতে সহজটাকে গ্রহণ করেননি, তবে যদি তা গুনাহের নামান্তর না হয়ে থাকে।' বুখারি : ৫৮৩৮

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

'আল্লাহ কোমল ব্যবহার করেন, তাই তিনি সকল ব্যাপারে কোমল ব্যবহার পছন্দ করেন।' বুখারি : ৫৫৯৯

مَنْ يُحْرَمِ الرِّفْقَ يُحْرَمِ الْخَيْرَ

'যে ব্যক্তি কোমল ব্যবহার থেকে বঞ্চিত সে কল্যাণ থেকেও সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত।' মুসলিম : ৬৩৬২

إِنَّ اللهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ

'আল্লাহ কোমল ব্যবহার করেন এবং তিনি কোমল ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন। তিনি কোমলতার ফলে এমন কিছু দান করেন যা কঠোরতা ও অন্য কোনো ব্যবহারের ফলে দান করেন না।' মুসলিম : ৬৩৬৫

এ ব্যাপক নির্দেশাবলী সামনে রেখে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লিপ্ত ব্যক্তিরা যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে নিজেদের মন মাফিক বিষয়গুলো বাছাই করার পরিবর্তে নিজেদের স্বভাব-চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ওই অনুযায়ী ঢালাই করার অভ্যাস করেন তাহলে তাদের মধ্যে দুনিয়ার অবস্থা ও সমস্যাবলীকে কুরআন ও সুন্নাহ প্রদত্ত নীতিতে সমাধান করার জন্য যে ভারসাম্য ও সমতাপূর্ণ চারিত্রিক গুণাবলির প্রয়োজন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে।

সংকীর্ণমনতা

ভারসাম্যহীন মেজাজের সাথে সামঞ্জস্যশীল আর একটি দুর্বলতাও মানুষের মধ্যে দেখা যায়। একে সংকীর্ণমনতা বলা যায়। কুরআনে একে 'শুহহে নাফস' বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআন বলে, 'যে ব্যক্তি এর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে সেই সাফল্য লাভ করেছে' (ওয়া মাই ইউকা শুহহা নাফসিহি ফাউলা-ইকা হুমুল মুফলিহুন) এবং কুরআন একে তাকওয়া ও ইহসানের পরিবর্তে একটি ভ্রান্ত ঝোঁক প্রবণতারূপে গণ্য করেছে (ওয়া উহিদরাতিল আনফুসুশ্ শুহহা ওয়া ইন তুহসিনু ওয়া তাত্তাকু ফাইন্নাল্লহা কানা বিমা তামালুনা খবিরা)। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের জীবন পরিবেশে অন্যের জন্য খুব কমই স্থান রাখতে চান। সে নিজে যতই বিস্তৃত হোক না কেন নিজের স্থান থেকে তার নিকট তা অত্যন্ত সংকীর্ণই দৃষ্টিগোচর হয়। আর অন্য লোক তার জন্য নিজেকে যতই সংকুচিত করুক না কেন, সে অনুভব করে যেন তারা অনেক ছড়িয়ে আছে। নিজের জন্য সে সব রকমের সুযোগ-সুবিধা চায় কিন্তু অন্যের জন্য কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা দিতে চায় না। নিজের সৎকাজগুলো নিছক ঘটনাক্রমে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করে।

নিজের দোষ তার দৃষ্টিতে ক্ষমাযোগ্য হয়ে থাকে কিন্তু অন্যের কোনো দোষই সে ক্ষমা করতে পারে না। নিজের অসুবিধাগুলোকে সে অসুবিধা মনে করে কিন্তু অন্যের অসুবিধাগুলো তার দৃষ্টিতে নিছক বাহানাবাজী মনে হয়। নিজের দুর্বলতার কারণে সে যে সুবিধা ভোগ চায় অন্যকে সে তা দিতে প্রস্তুত হয় না। অন্যের অক্ষমতার পরোয়া না করে সে তাদের নিকট চরম দাবি পেশ করে কিন্তু নিজের অমতার ক্ষেত্রে এসব দাবি পূরণ করতে সে রাজি থাকে না। নিজের পছন্দ-অপছন্দের মাফকাঠি ও রুচি সে অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু অন্যের রুচি ও পছন্দ-অপছন্দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য সে একটুও চেষ্টা করে না। এ অসৎ গুণটি বাড়তে বাড়তে চোগলখোরী ও অন্যের দোষখুঁজে বেড়ানোর এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে সে অন্যের সামান্য দোষের সমালোচনা করে কিন্তু নিজের দোষের সমালোচনায় লাফিয়ে ওঠে। এ সংকীর্ণমনতার আর একরূপ হচ্ছে দ্রুত ক্রোধান্বিত হওয়া, অহংকার করা ও পরস্পরকে বরদাশত না করা। সমাজজীবনে এহেন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি ওই ব্যক্তির সাথে চলাফেরাকারী প্রত্যেকটি লোকের জন্য বিপদস্বরূপ।

কোনো দলের মধ্যে এ রোগের অনুপ্রবেশ মূলত একটি বিপদের আলামত। দলবদ্ধ প্রচেষ্টা-সাধনা, পারস্পারিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা দাবি করে। এ ছাড়া চার ব্যক্তিও একত্রে মিলেমিশে কাজ করতে পারে না। কিন্তু সংকীর্ণমনতা ভালোবাসা ও সহযোগিতা সৃষ্টির সম্ভাবনা হ্রাস করে এবং অনেক সময় ওগুলোকে খতম করে দেয়। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হয় সম্পর্কের তিক্ততা ও পারস্পারিক ঘৃণা। এটি মানুষের মন ভেঙে দেয় এবং সহযোগিদেরকে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করে। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা কোনো মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য তো দূরের কথা সাধারণ সমাজজীবনের জন্য উপযোগী হতে পারে না। বিশেষ করে এ গুণটি ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উপযোগী গুণাবলির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। যেখানে সংকীর্ণমনতার পরিবর্তে উদারতা, কৃপণতার পরিবর্তে দানশীলতা, শাস্তির পরিবর্তে ক্ষমা এবং কঠোরতার পরিবর্তে কোমলতার প্রয়োজন। এজন্য ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু লোকের প্রয়োজন। এ দায়িত্ব একমাত্র তারাই পালন করতে পারে যারা উদার হৃদয়ের অধিকারী, যারা নিজেদের ব্যাপারে কঠোর ও অন্যের ব্যাপারে কোমল, যারা নিজেদের জন্য সর্বনিম্ন সুবিধা চায় এবং

অন্যের জন্য চায় সর্বোচ্চ সুবিধা, যারা নিজেদের দোষ দেখে কিন্তু অন্যের গুণ দেখে, যারা কষ্ট দেওয়ার পরিবর্তে কষ্ট বরদাশত করতে অভ্যস্ত বেশি এবং চলন্ত ব্যক্তিদের ঠেলে ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে যারা পড়ে যাচ্ছে তাদের হাত ধরে টেনে তোলার ক্ষমতা রাখে। এ ধরনের লোকদের সমন্বয়ে গঠিত দল কেবল নিজেদের বিভিন্ন অংশকে মজবুতভাবে সংযুক্ত রাখবে না; বরং তার চারপাশের সমাজের বিক্ষিপ্ত অংশকেও বিন্যস্ত করতে ও নিজের সাথে সংযুক্ত করতে থাকবে। বিপরীত পক্ষে সংকীর্ণমনা লোকদের দল নিজেরা তো বিক্ষিপ্ত হবেই ওপরন্তু বাইরের যে সমস্ত লোকও তাদের সংস্পর্শে আসবে তাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করে নিজের থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

দুর্বল সংকল্প

এ রোগটি মানুষের মধ্যে খুব বেশি দেখা যায়। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, কোনো আন্দোলনের ডাকে মানুষ অন্তর থেকে সাড়া দেয়, প্রথম প্রথম বেশ কিছুটা জোশও দেখায় কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তার জোশে ভাটা পড়ে। এমনকী যে উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সে অগ্রসর হয়েছিল তার সাথে তার কোনো সত্যিকার সংযোগ থাকে না। এবং গভীর আগ্রহ সহকারে যে দলে শামিল হয়েছিল তার সাথেও কোনো বাস্তব সম্পর্ক থাকে না। যে সমস্ত যুক্তির ভিত্তিতে সে এ আন্দোলনকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল সেগুলোর ওপর সে তখনো নিশ্চিত থাকে। সে মুখে তখনো তাকে সত্য ঘোষণা করতে থাকে এবং তার মন সায় দিতে থাকে যে, কাজটি করতে হবে এবং অবশ্যই করা উচিত। কিন্তু তার আবেগ ঠান্ডা হয়ে যেতে থাকে ও কর্মশক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। তার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ অসদুদ্দেশ্য স্থান পায় না। উদ্দেশ্য থেকে সে সরেও যায় না, আদর্শও পরিবর্তন করে না। এজন্য সে দল ত্যাগ করার চিন্তাও করে না কিন্তু প্রাথমিক আবেগ ও জোশ প্রবণতা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর এই সংকল্পের দুর্বলতাই বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।

সংকল্পের দুর্বলতার কারণে মানুষ প্রথম দিকে কাজে ফাঁকি দিতে থাকে। দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইতস্তত করে। উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে পিছপা হয়। যে কাজকে সে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গণ্য করে এগিয়ে এসেছিল দুনিয়ার প্রত্যেকটি কাজকে তার ওপর অগ্রাধিকার দিতে

থাকে। তার সময়, শ্রম ও সম্পদের মধ্যে তার ওই তথাকথিত জীবনোদ্দেশ্যের অংশ হ্রাস পেতে থাকে এবং যে দলকে সত্য মনে করে তার সাথে সংযুক্ত হয়েছিল তার সাথেও সে নিছক যান্ত্রিক ও নিয়মানুগ সম্পর্ক কায়েম রাখে। ওই দলের ভালো-মন্দের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না এবং তার বিভিন্ন বিষয়ে কোনো প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করে না।

যৌবনের পরে বার্ধক্য আসার ন্যায় এ অবস্থা ক্রমান্বয় সৃষ্টি হয়। নিজের এ অবস্থা সম্পর্কে মানুষ নিজে সচেতন না হলে এবং অন্য কেউ তাকে সচেতন না করলে কোনো সময়ও সে একথা চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করে না যে, যে বস্তুকে সে নিজের জীবনোদ্দেশ্য গণ্য করে তার জন্য নিজের ধন-প্রাণ উৎসর্গ করার সংকল্প করেছিল তার সাথে এখন সে কী ব্যবহার করছে। এভাবে নিছক গাফিলতি ও অজ্ঞানতার কারণে মানুষের আগ্রহ ও সম্পর্ক নিস্প্রাণ হয়ে পড়ে, এমনকী এভাবে অবশেষে একদিন নিজের অজান্তে তার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।

দলীয় জীবনে যদি প্রথমেই মানুষের মধ্যে এ অবস্থার প্রকাশ সম্পর্কে সতর্ক না হওয়া যায় এবং এর বিকাশের পথরোধ করার চিন্তা না করা হয় তাহলে যাদের সংকল্পের মধ্যে সবেমাত্র সামান্য দুর্বলতার অনুপ্রবেশ ঘটছে তারা ওই দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির ছোঁয়া পেয়ে যাবে এবং এভাবে ভালো কর্মতৎপর ব্যক্তিও অন্যকে নিষ্ক্রিয় দেখে নিজেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়বে। তাদের একজনও এ কথা চিন্তা করবে না যে, সে অন্যের জন্য নয়,; বরং নিজের জীবনোদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য এসেছিল এবং অন্যরা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলেও সে কেন তা থেকে বিচ্যুত হবে? তাদের এমন একদল লোকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যারা অন্য সাথীদের দেখাদেখি জান্নাতের পথ পরিহার করে। অর্থাৎ জান্নাত যেন তার নিজের মঞ্জিলে মকসুদ ছিল না। অথবা অন্য সাথীদের জান্নাতে যাওয়ার শর্তেই যেন সে জান্নাতে যেতে চাচ্ছিল। আর সম্ভবত অন্য সাথীদের জাহান্নামের দিকে যেতে দেখে সে তাদের সাথে জাহান্নামে যাবারও সংকল্প করবে। কারণ তার নিজের কোনো উদ্দেশ্য নেই, অন্যের উদ্দেশ্য তার উদ্দেশ্য। এ ধরনের মানসিক অবস্থার মধ্যে যারা বিচরণ করে তারা সর্বদা নিষ্ক্রিয় লোকদের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ করে। সক্রিয় লোকদের মধ্যে তারা অনুসরণযোগ্য কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পায় না।

তবুও সোজাসুজি কোনো ব্যক্তির সংকল্পের দুর্বলতার কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। কিন্তু মানুষ যখন একবার দুর্বলতার শিকারে পরিণত হয় তখন আরও বহু দুর্বলতাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে এবং খুব কম লোকই একটি দুর্বলতার সাহায্যে অন্যান্য দুর্বলতাগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠার পথ রোধ করার ক্ষমতা রাখে। সাধারণত মানুষ নিজেকে দুর্বল হিসেবে প্রকাশ করতে লজ্জা অনুভব করে। মানুষ তাকে দুর্বল মনে করবে এটা সে বরদাশত করতে প্রস্তুত হয় না। সংকল্পের দুর্বলতা তাকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, একথা সে সরাসরি স্বীকার করে না। একে ঢাকা দেওয়ার জন্য সে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে এবং তার প্রত্যেকটি পন্থাই একটি অন্যটির চাইতে নিকৃষ্টতম হয়।

যেমন, সে কাজ না করার জন্য নানান টালবাহানা করে এবং প্রতিদিন কোনো না কোনো ভুয়া ওজর দেখিয়ে সাথীদের ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে। সে বুঝাতে চায় যে, উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্ক ও সে ব্যাপারে আগ্রহের স্বল্পতা নিষ্ক্রিয়তার আসল কারণ নয়; বরং তার পথে যথার্থই বহু বাঁধা-বিপত্তি রয়েছে। এভাবে যেন নিষ্ক্রিয়তাকে সাহায্য করার জন্য মিথ্যাকে আহ্বান জানানো হলো। যে ব্যক্তি প্রথম দিকে কেবল উন্নতির উচ্চমার্গে পৌছানো পরিহার করেছিল এখান থেকেই তার নৈতিক পতন শুরু হলো।

এ বাহানা যখন পুরাতন হয়ে গিয়ে নিরর্থক প্রমাণিত হয় এবং এবার আসল দুর্বলতার রহস্যভেদ হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয় তখন মানুষ এ কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করে যে, সে আসলে নিজের দুর্বলতার কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি; বরং দলের কিছু দোষ-ত্রুটি তাকে মানসিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হতে সাহায্য করেছে। অর্থাৎ সে নিজে অনেক কিছু করতে চাচ্ছিল কিন্তু সাথীদের বিকৃতি ও ভ্রান্তি তার মন ভেঙে দিয়েছে। এভাবে পতনোন্মুখ ব্যক্তি যখন একটুও দাঁড়াতে পারে না তখন নিচে নেমে আসে এবং নিজের দুর্বলতা ঢাকার জন্য যে কাজ আঞ্জাম দিতে সে সক্ষম হয়নি তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়।

প্রথামবস্থায় এ মানসিক পক্ষাঘাতটি চাপা ও অস্পষ্ট থাকে। এ ব্যক্তির এ মানসিক রোগের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। শুধু দোষের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট চাপা অভিযোগ উত্থিত হয়। কিন্তু এর কোনো বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। সাথীরা যদি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে আসল রোগটি অনুধাবন করে তার

চিকিৎসার ব্যবস্থা করে, তাহলে এ পতোনোন্মুখ ব্যক্তিটির পতন সম্ভবত রোধ হতে পারে এবং তাকে ওপরেও উঠানো যেতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ নাদান বন্ধু অত্যধিক জোশ ও বিস্ময়ের কারণে ব্যাপারটি অনুসন্ধানে লিপ্ত হয় এবং তাকে বিস্তারিত বলতে বাধ্য করে। অতঃপর সে নিজের মানসিক রুষ্টতাকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত দুর্বলতাগুলো বাছাই করে করে একত্রিত করে। জামায়াতের ব্যবস্থা ও তার কাজের মধ্যে খুঁত আবিষ্কার করে এবং এসবের একটি তালিকা তৈরি করে একত্রিত করে সামনে রেখে দেয়। সে বলতে চায়, এসব গলদ দেখেই তার মন বিরূপ হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ তার যুক্তি হয় এই যে, তার মতো মর্দে কামেল যে সকল প্রকার দূর্বলতামুক্ত ছিল, সে কেমন করে এসব দুর্বল সাথী ও গলদে পরিপূর্ণ দলের সাথে চলতে পারে? এ যুক্তি গ্রহণ করার সময় শয়তান তাকে এ কথা ভুলিয়ে দেয় যে, এ কথা যদি সত্যি হতো তাহলে তার নিষ্ক্রিয় হওয়ার পরিবর্তে আরও বেশি কর্মতৎপর হওয়ার প্রয়োজন ছিল। যে কাজকে নিজের জীবনোদ্দেশ্য মনে করে তা সম্পাদন করার জন্য সে অগ্রসর হয়েছিল, অন্যেরা নিজেদের ভুলের কারণে যদি তাকে বিকৃত করার কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে, তাহলে তাকে অত্যধিক উৎসাহ-আবেগের সাথে ওই কাজ সম্পাদন করার জন্য আত্মনিয়োগ করা এবং নিজের গুণাবলির সাহায্যে অন্যের দোষের ক্ষতিপূরণ করা উচিত ছিল। আপনার ঘরে আগুন লাগলে ঘরের অন্যান্য লোকেরা যদি তা নিভাবার ব্যাপারে গাফিলতি করে তাহলে আপনি মন খারাপ করে বসে পড়বেন, না জ্বলন্ত ঘরকে রক্ষা করার জন্য গাফেলদের চাইতে বেশি তৎপর হবেন?

এ বিষয়ের সব চাইতে দুঃখজনক দিক হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের ভুল ঢাকার ও নিজেকে সত্যানুসারী প্রমাণ করার জন্য নিজের আমলনামার সমস্ত হিসাব অন্যের আমলনামায় বসিয়ে দেয়। এ কাজ করার সময় সে ভুলে যায় যে, আমলনামায় এমন একটি হিসাবও রয়েছে যেখানে কোনো প্রকার কৌশল ও প্রতারণার মাধ্যমে একটি অক্ষরও বাড়ানো যাবে না। সে অন্যের আমলনামায় অনেক দুর্বলতা দেখিয়ে দেয় অথচ সেগুলোর মধ্যে সে নিজে লিপ্ত থাকে। সে দলের কাজের মধ্যে এমন অনেক ত্রুটি নির্দেশ করে যেগুলো সৃষ্টি করার ব্যাপারে তার নিজের ভূমিকা অন্যের চাইতে কম নয়; বরং অনেক

বেশি। সে নিজে যেসব কাজ করেছে সেগুলোরই বিরুদ্ধে সে একটি দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা তৈরি করে এবং যখন সে বলে, এসব দেখে শুনে তার মন ভেঙে গেছে তখন তার পরিস্কার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এসব অভিযোগ থেকে সে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

মানুষের কোনো দল দুর্বলতাশূন্য হয় না। মানুষের কোনো কাজ ত্রুটিমুক্ত হয় না। মানুষের সমাজ সংশোধন ও পূনর্গঠনের জন্য ফিরিশতার সমাবেশ হবে এবং পরিপূর্ণ মান অনুযায়ী সমস্ত কাজ অনুষ্ঠিত হবে, দুনিয়ায় কখনো এমনটি দেখা যায়নি এবং দেখা যেতেও পারে না। দুর্বলতার অনুসন্ধান করলে কোথাও তার অস্তিত্ব নেই বলে দাবি করা যেতে পারে? ত্রুটি খুঁজে বেড়ালে তা পাওয়া যাবে না এমন কোনো জায়গাটি আছে? মানুষের কাজ দুর্বলতা ও ত্রুটি সহকারেই অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিপূর্ণ মানে পৌছার যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও কমপক্ষে এ দুনিয়ার এমন কোনো অবস্থায় পৌছার তার কোনো সম্ভাবনাই নেই যেখানে মানুষ ও তার কাজ সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও নিষ্কলঙ্ক হয়ে যায়।

এ অবস্থায় দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটিগুলো দূর করা বা পূর্ণতার মানে পৌছানোর জন্য আরও প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানোর উদ্দেশ্যে যদি এগুলোকে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে এর চাইতে ভালো কাজ আর নেই। এ পথেই মানুষের কাজের মধ্যে যাবতীয় সংশোধন ও উন্নতি সম্ভবপর। এ ব্যাপারে গাফিলতি দেখানো ধ্বংসের নামান্তর। কিন্তু যদি কাজ না করার ও মন খারাপ করে বসে যাবার জন্য বাহানা বানানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও সামষ্টিক দোষ-ত্রুটি তালাশ করা হয়, তাহলে তাকে একটি নির্ভেজাল শয়তানি ওয়াস-ওয়াসা ও নফসের কূটকৌশল বলে অভিহিত করা যায়। টালবাহানাকারী ব্যক্তি যেকোনো সম্ভাবনাময় অবস্থায় এ বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে ফিরিশতাদের কোনো দল এসে মানুষের স্থলাভিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত এ বাহানাবাজীর অবসান হবে না। যে ব্যক্তি নিজের দুর্বলতা ও দোষত্রুটি মুক্ত হওয়ার প্রমাণ পেশ না করে এ বাহানার আশ্রয় গ্রহণ করে তার পক্ষে এটা মোটেই শোভা পায় না। এসব কার্যকলাপের দ্বারা কখনো কোনো দুর্বলতা বা ত্রুটি দূর হয় না; বরং দুর্বলতা ও ত্রুটি বাড়ানোরই পথ প্রশস্ত করে। ফলে দেখা যায়, এ পথ অবলম্বন করে মানুষ তার চারপাশের অন্যান্য দুর্বলমনা লোকদের নিকট একটি খারাপ দৃষ্টান্ত পেশ করে। সে সবাইকে নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে সমাজে উপহাসের পাত্র

না হওয়ার এবং নিজের মনকেও ধোঁকা দিয়ে নিশ্চিন্ত করার পথ দেখিয়ে দেয়। প্রত্যেকটি নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি তার পথ অনুসরণ করে মানসিক পীড়ার ভান করতে শুরু করে এবং দুঃখ-কষ্টকে যথার্থ প্রমাণ করার জন্য সাথীদের দুর্বলতা ও দলের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে একটি তালিকা তৈরি করে। অতঃপর এখান থেকে অসৎ কাজের সিলসিলা শুরু হয়। একদিকে দলের মধ্যে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান এবং দোষারোপ ও পাল্টা দোষারোপের ব্যাধি সংক্রামিত হয়। এটি তার নৈতিক চরিত্র বিনষ্ট করে। অন্যদিকে ভালো ভালো সক্রিয় ও আন্তরিকতা সম্পন্ন কর্মী, যাদের মধ্যে কোনো দিন সংকল্পের দুর্বলতা ঠাঁই পায়নি, তারাও এ দুর্বলতা ও দোষ-ত্রুটির চর্চার ফলে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মানসিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে যেতে থাকে। তারপর এ রোগের চিকিৎসার জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে বিরূপমনা ব্যক্তিদের একটি ব্লক গড়ে উঠতে থাকে। মানসিক রুষ্টতা একটি পদ্ধতি ও আন্দোলনের রূপ লাভ করে। রুষ্ট করা ও রুষ্টতার স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা দস্তুরমতো একটি কাজে পরিণত হয়। যারা আসল উদ্দেশ্য সম্পাদনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তারা এ কাজে বেশ সক্রিয়তা দেখাতে থাকে। এভাবে তাদের মৃত আগ্রহ জীবন্ত হয়ে উঠে কিন্তু এমনভাবে এ জীবন লাভ হয় যে, মৃত্যুর চাইতে তার জীবন লাভ হয় অনেক বেশি শোকাবহ।

সমাজ সংশোধন ও পুর্নগঠনের জন্য সংগ্রাম চালানোর উদ্দেশ্যে গঠিত প্রত্যেকটি দলের এ বিপদটি সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। এ দলের কর্মী ও পরিচালকবৃন্দের সংকল্পের দুর্বলতা উদ্ভূত ক্ষতি, তার একক ও মিশ্রিতরূপের মধ্যকার পার্থক্য, তাদের প্রত্যেকের প্রভাব ও ফলাফল সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়া এবং তার প্রারম্ভিক চিহ্ন প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই তার সংশোধনের প্রয়োজন।

সংকল্পের দুর্বলতার মৌলিক রূপ হচ্ছে এই যে, দলের কোনো ব্যক্তি তার কাজকে সত্য এবং তা সম্পাদনের দায়িত্ব বহনকারী দলকে যথার্থ মেনে নিয়ে কার্যত নিষ্ক্রিয়তা ও অনীহা দেখাতে থাকে। এ অবস্থা সৃষ্টির সাথে সাথেই প্রতিকারমূলক কয়েকটি কাজ করা উচিত।

এক. এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অবস্থা অনুসন্ধান করে জানতে হবে তার নিষ্ক্রিয়তার আসল কারণ কী এবং সংকল্পের আসল দুর্বলতাই তাকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে অথবা কোনো সত্যিকার অসুবিধা তাকে নিষ্ক্রিয় হওয়ার পথে রসদ যোগাচ্ছে? যদি সত্যিকার অসুবিধার সন্ধান পাওয়া যায় তাহলে দলকে সে সম্পর্কে অবগত করা উচিত। এ অবস্থায় তা দূর করার জন্য সাথীকে সাহায্য করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা তার নিষ্ক্রিয়তার ভুল অর্থ গ্রহণ করব না এবং তা অন্যের জন্য একটি দৃষ্টান্তরূপেও প্রতিভাত হবে না। আর যদি সংকল্পের দুর্বলতাই আসল কারণ রূপে প্রতিভাত হয়, তাহলে আজে-বাজে পথে অগ্রসর না হয়ে যারা সত্যিকার অসুবিধার কারণে কর্মতৎপর হতে পারছে না তাদের থেকে এহেন ব্যক্তির বিষয়টি বুদ্ধিমত্তার সাথে দলের সম্মুখে আলাদা করে তুলে ধরতে হবে।

দুই. সংকল্পের দুর্বলতার কারণে যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তার অবস্থা যখনই দলের সম্মুখে উপস্থিত হয় তখনই আলোচনা ও উপদেশের মাধ্যমে তার দুর্বলতা দূর করার চেষ্টা করা উচিত। বিশেষ করে দলের ভালো ভালো লোকদের তার প্রতি নজর দেওয়া উচিত। তার মৃতপ্রায় প্রেরণাকে উদ্দীপ্ত ও কার্যত তাকে নিজেদের সাথে রেখে সক্রিয় করার চেষ্টা করতে হবে।

তিন. এহেন ব্যক্তির সমালোচনা করতে থাকা উচিত। দলের মধ্যে তার এ নিষ্ক্রিয়তা ও গাফিলতি যেন একটি মামুলি বিষয়ে পরিণত না হয়। অন্যেরা যেন পরস্পরের কাঁধে ভর করে বসে যেতেই না থাকে। দলের লোকেরা নিজেদের সময়, শ্রম ও সম্পদের কত অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারে এবং প্রকৃতপক্ষে কতটা ব্যয় করছে এবং নিজেদের যোগ্যতার তুলনায় তাদের কর্মতৎপরতার হার কী, এ সম্পর্কে দলের মধ্যে মাঝে মাঝে সমালোচনা পর্যালোচনা হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই সমালোচনার তুলাদণ্ডে যে ব্যক্তি হালকা প্রতীয়মান হয় তার পক্ষে লজ্জিত হওয়াই স্বাভাবিক। আর এ লজ্জা অন্যদের নিষ্ক্রিয়তা থেকে বাঁচাবে। কিন্তু এ সমালোচনা যেন এমনভাবে না হয় যার ফলে একক দুর্বল সংকল্পের অধিকারী ব্যক্তি মিশ্রিত সংকল্পের দুর্বলতায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। কোনো ব্যক্তির মধ্যে যে দুর্বলতা জন্ম নেয় তাকে দূর করতে না পারলেও কমপক্ষে বাড়াতে না দেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক পথ। অজ্ঞতার সাথে প্রয়োজনাতিরিক্ত জোশ দেখাবার

ফলে অসৎ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে আরও বৃহত্তম অসত্যের দিকে এগিয়ে দেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। সংকল্পের দুর্বলতার মিশ্রত রূপ হচ্ছে এই যে, মানুষ নিজের দুর্বলতার ওপর মিথ্যা ও প্রতারণার প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা করে এবং অগ্রসর হতে হতে একথা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, তার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই, যেটি আছে দলের মধ্যে। এটি নিছক একটি দুর্বলতাই নয়; বরং অসৎ চরিত্রের একটি প্রকাশও বটে। সততা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে যে দল দুনিয়ায় সংশোধন করতে চায় তার মধ্যে এ জাতীয় কোনো প্রবণতার বিকাশ ও লালনের সুযোগ না দেওয়া উচিত।

এর প্রথম পর্যায়ে মানুষ কাজ না করার জন্য মিথ্যা ওজর ও ভিত্তিহীন বাহানা পেশ করে। এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করা ওই ব্যক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার নামান্তর, যার মধ্যে এ নৈতিক দোষ প্রকাশিত হতে দেখা যায় এবং ওই জামায়াতের সাথেও বিশ্বাসঘাতকতারূপে প্রতীয়মান হয়, যার সাথে সংযুক্ত হয়ে বহু লোক একটি মহান উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য জান-মাল কুরবানি করতে ওয়াদাবদ্ধ হয়। এহেন দলে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে কমপক্ষে এতটুকু নৈতিক সাহস ও সক্রিয় বিবেক থাকতে হবে যার ফলে নিজের প্রেরণার দুর্বলতার কারণে কাজ না করলেও যেন সে নিজের দুর্বলতার দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি দেয়। একবার এ দুর্বলতা ঢাকার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার চাইতে ভুলের স্বীকৃতি দিয়ে কোনো ব্যক্তির সারা জীবন এ দুর্বলতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকা অনেক বেশি ভালো। এ ভুল প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই তার সমালোচনা হওয়া উচিত এবং কখনো একে উৎসাহিত করা উচিত নয়। নিরিবিলিতে সমালোচনা করার পর যদি সে এ পথ পরিহার না করে তাহলে প্রকাশ্যে দলের মধ্যে তার সমালোচনা করতে হবে এবং যে সব ওজরকে সে যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে সেগুলোর চেহারা উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতা ও গাফিলতি দেখানোর অর্থ হচ্ছে যে সমস্ত ত্রুটির বিষয় ইতঃপূর্বে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে দলের মধ্যে সেগুলোর অনুপ্রবেশের দুয়ার উন্মুক্ত করা।

এর দ্বিতীয় পর্যায়ে গাফেল ও নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি নিজের অবস্থার জন্য দলের লোকদের দুর্বলতা এবং দলের কাজ ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটিসমূহকে দায়ী করে সেগুলোকেই নিজের বিরূপতার কারণ গণ্য করে। আসলে এটি হচ্ছে

বিপদের সিগন্যাল। এ থেকে ওই ব্যক্তি যে ফিতনা সৃষ্টির দিকে অগ্রসর হচ্ছে তার সন্ধান পাওয়া যায়। এ অবস্থায় তাকে ওই বিরূপতার বিস্তারিত কারণ জিজ্ঞেস করা ভুল। তাকে এ প্রশ্ন করার ফল দাঁড়াবে যে, যে ফিতনার পথের মাথায় সে পৌঁছে গেছে তার ওপর তাকে পরিচালিত করতে সাহায্য করা হবে। এখানে তাকে দোষারোপ করার ব্যাপক অনুমতি দেওয়ার পরিবর্তে তার বন্ধুদের উচিত তাকে আল্লাহর ভয় দেখানো এবং তাকে এই মর্মে লজ্জা দেওয়া যে, তার নিজের ত্রুটিপূর্ণ কর্ম ও চরিত্র নিয়ে সে কেমন করে অন্যের সমালোচনা করার সাহস করে। পরিশ্রমকারী, সক্রিয় ও তৎপর ব্যক্তিরা এবং যারা অর্থ ও সময়ের বিপুল কোরবানি করেছে তারা যদি তার কর্মহীনতাকে নিজেদের বিরূপতার কারণ রূপে গণ্য করে তাহলে তা যুক্তিসংগত হবে। কিন্তু যেখানে বিরূপকারীর দোষগুলো সৃষ্টির ব্যাপারে তার নিজের অংশ অন্যের চাইতে বেশি এবং কাজ নষ্ট করার ব্যাপারে তার নিজের কাজ অন্যের জন্য দৃষ্টান্তে পরিণত হচ্ছে, সেখানে সে কেমন করে বিরূপ হয়? সন্দেহ নেই নিজের সমস্ত দোষত্রুটি ও দুর্বলতা সম্পর্কে অবশ্যই দলকে অবহিত থাকতে হবে এবং দলকে কখনো এগুলো জানার ব্যাপারে গড়িমসি করা এবং এগুলো সংশোধনের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কিন্তু দলের যে সব কর্মী দলের কাজের ব্যাপারে সবচাইতে বেশি তৎপর এবং যারা জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করে এগুলো বিবৃত করা তাদের কাজ। ওপরন্তু তারা ঈমানদারীর সাথে সমালোচনাও করতে পারে। যেসব লোক কাজে ফাঁকি দেয়, ঢিলেমি দেখায় ও ত্রুটিপূর্ণ কাজ করে তারা অগ্রসর হয়ে দলের ত্রুটি ও দুর্বলতা বর্ণনা করবে, কোনো নৈতিক আন্দোলনে তারা কেবল নিজেদের লজ্জা ও ত্রুটি স্বীকার করে যাবে, সমালোচনা ও সংস্কার করার যোগ্যতা তাদের নেই। এ যোগ্যতায় তারা নিজেরাই যদি অধিষ্ঠিত হয় তাহলে এটি মারাত্মক নৈতিক দোষের আলামতরূপে গণ্য হবে। আর যদি দলের মধ্যে যোগ্যতা স্বীকৃত হয়, তাহলে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে, দল নৈতিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে একটা নীতিগত কথা মনে রাখা প্রয়োজন। তা এই যে, একটি গতিশীল দলের সুস্থ অঙ্গসমূহের অনুভূতি ও অসুস্থ অঙ্গসমূহের অনুভূতির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বিরাজমান। তার সুস্থ অঙ্গসমূহ সর্বদা নিজেদের কাজের মধ্যে মগ্ন থাকে। এ কাজকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য নিজেদের ধন, মন,

প্রাণ সবকিছু নিয়োজিত করে। তাদের কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, তারা কার্যসম্পাদনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এবং এ ব্যাপারে কোনো প্রকার দুর্বলতা ও গাফিলতি দেখায়নি। আর অসুস্থ অঙ্গসমূহ কখনো নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে না অথবা কিছুকাল তৎপর থাকার পর নিষ্ক্রিয়তার শিকার হয়। তাদের কার্যবিবরণী তাদের গাফিলতির সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করে। এ দুধরনের অনুভূতির পার্থক্য সুস্থ চোখ ও অসুস্থ চোখের দৃষ্টিশক্তির মধ্যকার পার্থক্যের সমান। দল কেবল নিজের সুস্থ অঙ্গসমূহের অনুভূতির মাধ্যমেই নিজের দুর্বলতা ও ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারে। যে অঙ্গ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে এবং কাজ থেকে দুরে থাকার জন্য নিজের বিরূপ মনোভাবের কথা প্রকাশ করছে সে কখনো তার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হতে পারে না। তার অনুভূতি শতকরা একশো ভাগ না হলেও আশি-নব্বই ভাগ বিভ্রান্তিকর হবে। যে দল আত্মহত্যা করতে চায় না সে কোনো ক্রমেই এধরনের অনুভূতির ওপর নিজের ফলাফলের ভিত্তি স্থাপন করতে পারে না। ত্রটি ও দুর্বলতা যা কিছু উপস্থিত করা হবে তা শুনে অমনি সঙ্গে সঙ্গেই কান্না জড়িত কণ্ঠে তওবা ও ইস্তেগফার করা উচিত। অতঃপর তার ওপর আমাদের কাজের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করা উচিত, এ ধরনের কথা হয়তো কোনো নেকির কাজ হতে পারে, কিন্তু তা কোনো বুদ্ধিমানের নেকি নয়, বোকার নেকি। এ জাতীয় নেক লোকেরা দুনিয়ায় অতীতে কিছুই করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না। নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা যত বড়ো অজ্ঞতা, যেকোনো ব্যক্তির মন্তব্যের ভিত্তিতে নিজের ত্রুটি ও কর্মক্ষমতার আন্দাজ করে নেয়া এবং মন্তব্যকারী পরিস্থিতি সম্পর্কে কত দূর যথার্থ জ্ঞান রাখে এবং সে সম্পর্কে সঠিক মন্তব্য করার যোগ্যতা তার কতটুকু এ বিষয়টি যাচাই না করাও তার চাইতে কম অজ্ঞতা নয়।

এ পর্যায়ে আর একটি কথাও ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত। যদি কোনো দল একটি আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে চায় তবে তার সামনে কাজের যোগ্যতা ও নৈতিকতার দুটি ভিন্ন মান থাকে। একটি হচ্ছে অভীষ্ট মান অর্থাৎ যে সর্বোচ্চ মানে উন্নীত হওয়ার জন্য অনবরত প্রচেষ্টা ও সাধনা চালাতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কার্যোপযোগী হওয়ার সর্বনিম্ন মান, যার ভিত্তিতে কাজ চালানো

যেতে পারে এবং যার থেকে নিচে নেমে যাওয়া অসহনীয়। এ দুধরনের মান সম্পর্কে বিভিন্ন মানসিকতা সম্পন্ন লোক বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করে। এক ধরনের মানসিকতাসম্পন্ন লোক আসল উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় না। কাজের সাথে সম্পৃক্ত থেকেও এমনভাবে এর মধ্যে শামিল হতে পারে যার ফলে তার ধন, সময়, শক্তি বিন্দুমাত্র ক্ষয়িত হয় না। এ মানসিকতা অনেক সময় চিন্তার বিলাসিতা ও পলায়নী প্রচেষ্টার জন্য প্রবঞ্চনামূলক ওজর হিসেবে নৈতিকতার আকাশে বিচরণ করে এবং অভীষ্ট মানের চাইতে কমের ওপর কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না। যা কিছু সে এর চাইতে কম দেখে তারই ওপর নিজের বিপুল অস্থিরতা ও বিরূপতা প্রকাশ করে। কিন্তু কাজে অধিকতর উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য নয়; বরং সচেতন বা অবচেতন যেকোনোভাবেই হোক কাজ থেকে পলায়ন করার জন্যই এ অস্থিরতা ও বিরূপতার প্রকাশ ঘটায়।

দ্বিতীয় ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক যদিও উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয় কিন্তু ভাববাদীতার শিকার হওয়ার কারণে অভীষ্ট মান ও কার্যোপযোগী হওয়ার সর্বনিম্ন মানের মধ্যকার যথাযথ পার্থক্য অনুধাবন করে না। এ ব্যক্তি নিজেই বারবার দোটানায় পড়ে যায়। ওপরন্তু প্রথম ধরনের মানসিকতার ছোঁয়াও সহজেই লেগে যায়। এভাবে সে নিজেই নিজেকে পেরেশান করে এবং যারা কাজ করে তাদের জন্যও যথেষ্ট পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোক যথার্থই উদ্দেশ্যের জন্য কাজ করে। তারা নিজেদের ওপর এ কাজের সাফল্য ও ব্যর্থতার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে এ অনুভূতি রাখে। তাদের এ অবস্থা ও দায়িত্ব বোধের কারণে তারা বাধ্য হয়ে সব সময় দুধরনের মানের মধ্যে যথাযথ পার্থক্য বজায় রেখে কাজ করে এবং কোনো যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রগতি যেন প্রভাবিত হতে না পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখে। তারা কখনো অভীষ্ট মান বিস্মৃত হয় না। সে পর্যন্ত পৌঁছনোর চিন্তা থেকে এক মূহুর্তও গাফেল হয় না। তা থেকে নিম্ন মানের প্রতিটি বস্তু সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে। কিন্তু কর্মোপযোগী সর্বনিম্ন মানের মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে এবং এ মান থেকেও লোকদের নিচে নেমে যাওয়ার কারণে নিজেদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করার বদলে তাদের

সরিয়ে দূরে নিক্ষেপ করাকে অধিক উত্তম মনে করে। তাদের জন্য নিজেদের শক্তির যথাযথ জরিপ ও সে অনুযায়ী কর্যবিস্তার করা ও তার গতিবেগের মধ্যে কমবেশি করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ভুল করলে তারা নিজেদের উদ্দেশ্যের ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু যে ব্যক্তি এ জরিপ করার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ধরনের মানসিকতার মাধ্যমে পথ নির্দেশ লাভ করবে সে মারাত্মক অজ্ঞতার প্রমাণ দেবে। একমাত্র এই তৃতীয় ধরনের মানসিকতাই তার সহায়ক ও সাহায্যকারী হতে পারে এবং এ মানসিকতাই গড়ে তুলতে হবে।